চশমায়ে মসীহি

[খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্ব]

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ মাওউদ (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর প্রতিষ্ঠাতা

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

একটি আহমদীয়া খিলাফত শতবার্ষিকী প্রকাশনা

প্রকাশক
মাহবুব হোসেন
ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

অনুবাদক
মরহুম মৌলবী মহম্মদ আজিম উদ্দিন আহমদ, বিএ
ঢাকা মাদ্রাসার ভূতপূর্ব প্রধান ইংরেজী শিক্ষক

সম্পাদনা ও চলিতকরণ
আলহাজ্জ মৌলবী মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ (উর্দু)- ৯মার্চ, ১৯০৬
প্রথম বাংলা সংস্করণ- ২৩ মার্চ, ১৯৩১
দ্বিতীয় বাংলা সংস্করণ- ১০ এপ্রিল, ১৯৮২
তৃতীয় বাংলা সংস্করণ- ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯

সংখ্যা
২০০০ কপি

মুদ্রণে
ইন্টারকন এসোসিয়েটস্‌
৫৬/৫ ফকিরেরপুল বাজার, মতিঝিল, ঢাকা

Chashmaey Moseehi

Published by **Mahbub Hossain**
National Secretary Isha'at
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211

ISBN 984 991 005-4

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

ভূমিকা

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) আহমদীয়া খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী (১৯০৮-২০০৮) উদযাপনের লক্ষ্যে জামা'তের সামনে ২০০5 সনে এক সুদূর প্রসারী রূহানী ও জাগতিক কর্মসূচী পেশ করেন। এই কর্মসূচীর আওতায় বিভিন্ন প্রকাশনাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উক্ত স্কীমের অধীনে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের প্রকাশনার তালিকায় হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কর্তৃক ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রণীত **চশমায়ে মসীহি** (খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্ব) পুস্তকটিও বিদ্যমান। চশমায়ে মসীহি-এর প্রথম বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয় ২৩ মার্চ, ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে এবং বাংলা ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১০ এপ্রিল, ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে। প্রথম এটি বাংলা সাধুরীতিতে অনুবাদ করেছিলেন মরহুম মৌলবী মহম্মদ আজিম উদ্দিন আহমদ, বিএ, ঢাকা মাদ্রাসার ভূতপূর্ব প্রধান ইংরেজি শিক্ষক। আল্লাহ্ তা'লা তার এ মহতি কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার দিয়ে থাকবেন এটাই আমাদের প্রার্থনা।

বর্তমানে আহমদীয়া খিলাফত শতবার্ষিকী উপলক্ষে অনুবাদটি বাংলা চলিত রীতিতে পরিমার্জিত করে দিয়েছেন আলহাজ্জ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান সাহেব। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে এবং এর প্রকাশনার সাথে যারা অবদান রেখেছেন তাদের সকলকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।

বাংলাভাষী খ্রিস্টান ভাইদের জন্য এ পুস্তকটি তাদের সঠিক পথের সন্ধান দিবে যদি তারা উন্মুক্ত মনে আন্তরিকতার সহিত এটি পাঠ করেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং আমাদিগকে পুরস্কৃত করুন, আমীন।

মোবাশেরউর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
২৪ ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদকের নিবেদন

পাদরীগণ সুদূর ইউরোপ আমেরিকা হতে এদেশে এসে ইসলাম ধর্মকে ভীষণভাবে আক্রমণ করেছে এবং এর বিরুদ্ধে লাখো লাখো পুস্তক-পুস্তিকা প্রচার করেছে কিন্তু এগুলোর উপযুক্ত যুক্তিসঙ্গত ও হৃদয়গ্রাহী উত্তর পূর্ণ ও যথেষ্ট সংখ্যক পুস্তক-পুস্তিকার প্রচার এবং ত্রিত্ববাদী খ্রিষ্টান ধর্মের উপর বিমল জ্যোতির্ময় একত্ববাদী ইসলাম ধর্মের পাল্টা আক্রমণ বাংলাদেশে এখনও রীতিমত আরম্ভ হয়নি। এ পুস্তকখানা পাঠ করে যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করলে পাদরীগণকে তাদের ভ্রম দেখিয়ে দিতে পারবেন এবং দেখবেন যে এ নব কিরণমালার তেজে পাদরীগণের সকল যুক্তি ও চাতুরী জলে লবণবৎ গলে যাবে।

খাকছার

মহম্মদ আজিম উদ্দিন আহমদ, বি এ

লেখক পরিচিতি

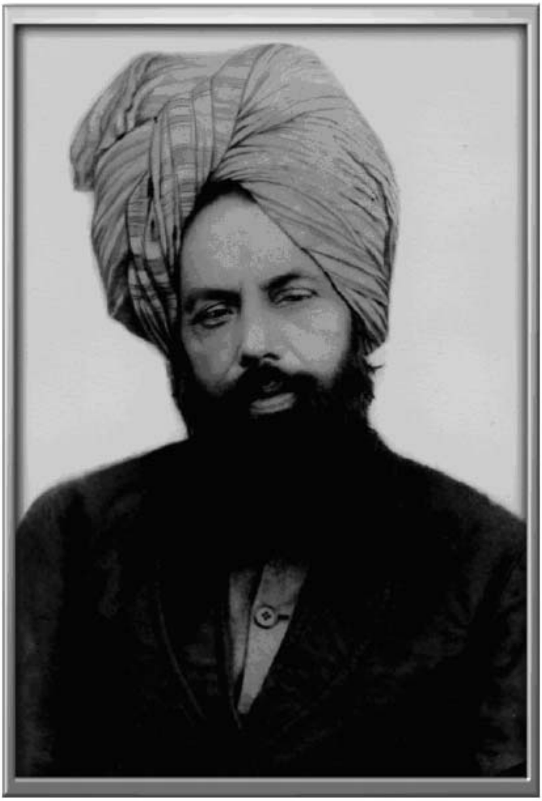

প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ১৮৩৫ সনে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পবিত্র কুরআন-এর গবেষণা ও মাহাত্ম্য অনুসন্ধান, দোয়া ও একান্ত ধর্মপরায়ণ জীবন যাপন করেন। চারদিক হতে ইসলামের উপর নোংরা অপবাদ, আক্রমণ, মুসলমানদের ভাগ্যের চরম অবনতি, নিজ ধর্ম-বিশ্বাসে সন্দেহ-সংশয় ও নামমাত্র ধর্ম পালন ইত্যাদি অবলোকন করে তিনি ইসলামের যথার্থ ও পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর অসংখ্য লেখা (প্রায় ৮৮টি পুস্তক) বক্তৃতা, আলোচনা, ধর্মীয় বিতর্ক (বাহাস)

প্রভৃতিতে তিনি যুক্তি উপস্থাপন করেন যে, ইসলাম-ই একমাত্র জীবন্ত ধর্ম এবং একমাত্র এর বিশ্বাসসমূহকে অবলম্বনের মাধ্যমেই কেবল মানবকূল তার সৃষ্টিকর্তা প্রকৃত খোদার সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। কুরআন-এর শিক্ষা ও ইসলাম ধর্মের প্রচারিত রীতি-নীতিই কেবল মানব জাতিকে নৈতিকতা, উন্নততর বুদ্ধিবৃত্তি এবং আধ্যাত্মিকতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছাতে পারে। তিনি ঘোষণা করেন- কুরআন, বাইবেল ও হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মহান আল্লাহতা'লা তাঁকে মসীহ্ ও মাহ্দী হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। ঐশী আদেশে ১৮৮৯ সন হতে তিনি তাঁর হাতে একত্রিত হওয়ার জন্য বয়আত গ্রহণ করা শুরু করেন যা এখন বিশ্বের ১৯৩ টি দেশ জুড়ে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। ১৯০৮ সনে প্রতিশ্রুত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ওফাতের পর হযরত মাওলানা হেকীম নুরুদ্দীন (রা.) খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল প্রথম খলিফা নির্বাচিত হয়ে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯১৪ সনে খলীফাতুল মসীহ আওওয়াল-এর মৃত্যুর পর প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র (আ.) প্রতিশ্রুত পুত্র হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) প্রায় ৫২ বছর খলীফাতুল মসীহ্ হিসেবে তার কার্যক্রম চালিয়ে যান। ১৯৬৫ সনে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বড় পুত্র ও ইমাম মাহ্দীর প্রতিশ্রুত পৌত্র মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) খলিফা নির্বাচিত হন। প্রায় ১৭ বছর জামা'তের অভূতপূর্ব সেবা করার পর ১৯৮২ সনে তাঁর তিরোধান হয় এবং তাঁর ছোট ভাই হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) খলিফা নির্বাচিত হন। ১৯শে এপ্রিল ২০০৩ সন মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) জামা'তকে বিশ্বে পরিচিতি ও বর্তমানের শক্তিশালী অবস্থায় আনার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদান করেন। হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) খলীফাতুল মসীহ্ খামেস বর্তমানে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলীফা, আধ্যাত্মিক পিতা ও প্রধান হিসেবে নেতৃত্ব দান করছেন এবং তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর প্রপৌত্র হওয়ার সৌভাগ্যের অধিকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

চশমায়ে মসীহি বা খ্রিষ্টান ধর্মতত্ত্ব[1]

পাদরী সাহেবদের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে আমার আর কিছুই লেখার আবশ্যকতা ছিল না। কারণ আমাকে যা করতে হতো অধুনা তাদের নেতৃস্থানীয় ইউরোপ ও আমেরিকা নিবাসী সুবিজ্ঞ পন্ডিতরাই তা নিজ হাতে গ্রহণ করে খ্রিষ্টান ধর্মের মূলতত্ত্বের উদ্ভাবনার কাজ অতি সূচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন। কিন্তু সেদিন বায়বেরেলী হতে একজন অনভিজ্ঞ মুসলমানের এক পত্র এসে উপস্থিত। তিনি তাঁর পত্রে এক পাদরী প্রণীত ‘ইউ নাবীউল ইসলাম’ নামক পুস্তকের মহা অনিষ্টের কথা উল্লেখ করেছেন। দুঃখের বিষয় অধিকাংশ মুসলমান উদাসীনতাবশতঃ আমাদের প্রণীত পুস্তকগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করতে ইচ্ছুক নয় এবং আমাদের ওপর খোদা তা'লা যে সম্পদরাজি অবতীর্ণ করেছেন সে সম্বন্ধেই তারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। অজ্ঞ মৌলবীরা আমাদেরকে কাফির ও বিধর্মী ঘোষণা করে মুসলমান জনসাধারণ ও আমাদের মাঝে এক অতি উঁচু দেয়াল তৈরী করে দিয়েছেন। তারা অবগত নন, খ্রিষ্টধর্মের প্রতারণা ও প্রলোভন যে সময় আসলে কার্যকরী হতো এখন এর অবসানের যুগ আরম্ভ হয়েছে। মানবের আদিপুরুষ আদমের জন্মের ছয় হাজার বছর এখন অতীত প্রায়। এ যুগে ঐশী বিধানের বিজয় লাভ অবশ্যম্ভাবী। আলো ও আঁধারের এ শেষ যুদ্ধ[2]। এতে আলোর জয় ও প্রাধান্য আর অন্ধকারের চিরপলায়ন সুনিশ্চিত। পাদরী মহোদয়গণের এ ভুল বিশ্বাসগুলো সম্বন্ধে কোন পুস্তক রচনা করা অনাবশ্যক

---

১. এ নামের অর্থ এই নয় এটা ঈসা নবী বা যিশুখ্রিষ্টের প্রবর্তিত ধর্মের শিক্ষা। কারণ তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষা পৃথিবী হতে বিলুপ্ত হয়েছে, আধুনিক খ্রিষ্টধর্ম ঈসা নবীর ধর্ম নয় এটা পথভ্রান্ত খ্রিষ্টানদের কাল্পনিক নতুন ধর্ম।

২. এ ‘যুদ্ধ’ শব্দে তরবারী বা বন্দুকের যুদ্ধকে বুঝায় না, কারণ খোদা তা'লা এখন এরূপে জেহাদ করতে নিষেধ করেছেন। প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আগমনকালে এরূপ জিহাদ নিষিদ্ধ হওয়া আবশ্যক ছিল। তিনি কুরআনে ইতিপূর্বেই এর সংবাদ দিয়েছেন এবং বুখারীতে প্রতিশ্রুত মসীহ্ সম্বন্ধে এ হাদীসে লিখিত আছে -‘ইয়াজাউল হার্‌ব’।

হলেও উল্লেখিত ব্যক্তির একান্ত অনুরোধে আমাকে এ ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখতে হলো। খোদা তা'লা একে বরকতপূর্ণ করুন ও মানবজাতির সুপথ প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ করুন, আমীন।

স্মরণ রাখবেন, আমরা হযরত ঈসাকে (আ:) সম্মান করি ও তাঁকে খোদা তাআলার নবী বলে বিশ্বাস করি।[৩] ইহুদীরা আজকাল যেসব প্রতিবাদ প্রচার করেছে, আমরা সেই সবের সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু আমি দেখাতে চাই, ইহুদীরা যেমন শুধু অন্ধবিশ্বাস ও হঠকারিতায় অভিভূত হয়ে হযরত ঈসা ও তাঁর ইঞ্জীলের ওপর অযথা আক্রমণ করে, খ্রিষ্টানরাও ঠিক সেভাবে হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ও তাঁর কুরআনের ওপর আক্রমণ করে। ইহুদীদের এ অসৎপথের অনুসরণ করা খ্রিষ্টানগণের উচিত ছিল না। কিন্তু চিরন্তন প্রথা এই, মানুষ সত্য ও ন্যায় পথে থেকে কোন ধর্মের আক্রমণ করতে অসমর্থ হলে অনেকেই অমূলক অপবাদ দ্বারা উক্ত ধর্মের আক্রমণ করতে আরম্ভ করে। 'ইউ নাবীউল ইসলাম' প্রণেতা ঠিক এভাবেই ইসলাম ধর্মের ওপর আক্রমণ করেছেন। সংসার প্রেমেই এ বদভ্যাসের সৃষ্টি হয় নতুবা আধুনিক যুগের উপযোগী ঐশী ধর্ম শুধু ইসলাম। এরই আশীর্বাদ এখনও নতুন ও সজীব অবস্থায় বিদ্যমান। এতে পবিত্র ঝরনার সম্পদরাজি মানবকে জীবিত খোদার সন্নিকটে পৌঁছে দিতে সমর্থ। কিন্তু কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের খানইয়ার স্ট্রীটে সমাহিত মানবকল্পিত ঈশ্বর কাউকেও সহায়তা করতে সমর্থ নন। এখন আমি বেরেলীর পত্র লেখককে আহ্বান করে আমার ক্ষুদ্র পুস্তিকা আরম্ভ করছি।

লেখক

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ
১লা মার্চ, ১৯০৬

---

৩. হযরত ঈসা আলায়হেস্ সালামের প্রকৃত সম্মানের প্রতিকূলে আমরা যা লিখেছি, তা শুধু এল্যামী জবাব (আপত্তি ও খন্ডনমূলক) আর কিছুই নয়।
দুঃখের বিষয় যদিও পাদরী সাহেবদের প্রকৃত সভ্যতা, শিষ্টাচার ও খোদাভীতি নেই। আর আমাদের নবী (স:)-কে অজস্র গালি বর্ষণ করেন। তথাপি মুসলমানগণ তাদেরকে ২০ গুণ সম্মান করুন এরূপভাব অন্তরে পোষণ করেন।

بسم الله الرحمن الرحيم

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

আস্‌সালামু আলায়কুম। আপনি 'ইউ নাবীউল ইসলাম' নামক খ্রিষ্টান পুস্তক পাঠ করে আমাক যে পত্র লিখেছেন তা আমি অতি পরিতাপের সাথে পাঠ করেছি। বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, যাদের খোদা মৃত, যাদের ধর্ম মৃতধর্মে পরিণত, যাদের ধর্মগ্রন্থ জীবনশক্তিশূন্য ও আধ্যাত্মিক চক্ষু হীনতায় যারা স্বর্বস্বান্ত ও প্রাণহীন তাদের অসত্য কথা ও অপবাদ সম্বলিত কাহিনী অধ্যয়নে আপনি আজ ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে সন্দেহ করেছেন? (ইন্না লিল্লাহি .... রাজিউন)।

স্মরণ রাখবেন, এ জাতি ধর্মের উন্নতিকল্পে অসত্য প্রচার ও অপবাদ সম্বলিত পুস্তক রচনায় জগতের যাবতীয় জাতির অগ্রণী হয়েছে। সত্যের সহায়কল্পে যে জ্যোতি আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়ে ক্রমান্বয়ে বহুসংখ্যক প্রমাণ ও নিদর্শন দ্বারা সত্য ধর্মকে স্পষ্ট ও পৃথক করে দেখিয়ে দেয়, সে ধর্মীয় জ্যোতি তাদের কাছে মজুদ নেই বলে তারা চিরজীবিত ও জ্যোতির্ময় ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে মানব হৃদয়ে অসন্তোষ জন্মাতে নানাবিধ মিথ্যা কথা, প্রতারণা, ছলনা, ধোঁকাবাজী জালিয়াতি প্রভৃতি অসদুপায় অবলম্বন করে। এদের হৃদয় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও কালিমাময়। এরা খোদাকে ভয় করে না। কিরূপে মানুষ আঁধারের সাথে প্রেম করে আলো পরিত্যাগ করবে দিবারাত্রি এরা সেই উপায় উদ্ভাবনায় ব্যস্ত। আপনার ন্যায় ব্যক্তিকে এরূপ লোকের প্রণীত পুস্তক পাঠে বিচলিত হতে দেখে আমি বড়ই আশ্চর্যান্বিত হয়েছি। যে যাদুকররা মূসা নবীর সম্মুখে রজ্জুগুলোকে সাপে পরিণত করে দেখিয়েছিল এরা সেই যাদুকরদেরকেও হার মানিয়েছে। কিন্তু যেমন মূসা খোদার নবী বলে তাঁর ষষ্টি তাদের সাপগুলোকে গিলে ফেলেছিল, সেরূপ কুরআন শরীফ খোদার ষষ্টি বলে দিন দিন এদের রজ্জু নির্মিত সর্পগুলোকে গ্রাস করছে। এমন এক সময় আসবে বরং সে সময় অতি নিকটবর্তী, যখন এ রুজ্জু নির্মিত সর্পগুলোর নাম ও চিহ্ন ধরাতল হতে বিলুপ্ত হবে। 'ইউ নাবীউল ইসলাম' প্রণেতা যদিও এটা দেখাতে চেষ্টা করছেন যে কুরআন অমুক অমুক গল্পকাহিনী বা গ্রন্থসমূহ হতে সঙ্কলিত হয়েছে কিন্তু তার কৃতকার্যতা, জনৈক ইহুদী বিজ্ঞ পন্ডিত ইঞ্জীলের মূল নির্ণয় করতে যে চেষ্টা করেছেন, তার কৃতকার্যতার হাজার ভাগের এক ভাগও নয়। উক্ত পন্ডিত তার মতে সপ্রমাণ করেছন যে ইঞ্জীলের নৈতিক শিক্ষা ইহুদীদের ধর্মশাস্ত্র 'তালমূদ' ও অন্যান্য কতগুলো ইহুদী পুস্তক হতে

সংগৃহীত এবং অপহরণকার্য এতই সুস্পষ্ট যে পাতার পর পাতা অক্ষরে অক্ষরে নকল করা হয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন, ইঞ্জীল শুধু অপহৃত সামগ্রীর সমষ্টি মাত্র। বিশেষত পার্বতীয় উপদেশ– Sermon on the Mount কে, যা নিয়ে খ্রিষ্টানগণ এত গর্ব করেন, তালমূদ হতে শব্দে শব্দে উদ্ধৃত করে সম্পূর্ণরূপে এরই লিখিত বর্ণনা ও বাক্যাবলী বলে প্রমাণ করেছেন। এরূপে অন্যান্য পুস্তক হতে বহু অপহৃত বাক্য উদ্ধৃত করে জগদ্বাসীকে হতভম্ভ করে তুলেছেন। ইউরোপীয় সুবিজ্ঞ সমালোচক পন্ডিতগণও আজ আন্তরিক অনুরাগের সাথে এ দিকে আকৃষ্ট। বর্তমান যুগে আমি জনৈক হিন্দু রচিত একখানা পুস্তক পাঠ করেছি। এতে তিনি ইঞ্জীলকে বুদ্ধের ধর্মনীতি হতে সঙ্কলিত ও অপহৃত পুস্তক বলে প্রমাণ করতে প্রয়াসী হয়ে বুদ্ধের নৈতিক শিক্ষা উদ্ধৃত করত। এর প্রমাণ দিয়েছেন। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই, শয়তান বুদ্ধকে পরীক্ষা করতে কয়েক স্থানে নিয়ে গিয়ে তাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে নানারূপে চেষ্টা করছে বলে বৌদ্ধ সমাজে প্রচলিত এক অতি প্রসিদ্ধ গল্প ইঞ্জীলেও লিখিত আছে দেখে সবাই এ ধারণা করতে পারেন যে সামান্য পরিবর্তন সহ সেই অপহৃত বৌদ্ধ গল্পই বাইবেলে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। হযরত ঈসা আলায়েহেস সালাম যে ভারতবর্ষে এসেছিলেন তা সুচারুরূপে প্রমাণিত হয়েছে। হযরত ঈসার কবর যে কাশ্মীরের শ্রীনগর বিদ্যমান, তাও আমি প্রমাণ দিয়ে সুসিদ্ধ করেছি। অতএব প্রতিবাদকারীগণ একথা বলতে আরও সুযোগ পান যে বর্তমান ইঞ্জীলসমূহ প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধধর্মেরই এক প্রতিমূর্তি ও নকল মাত্র। এ প্রমাণসমূহের পরিমাণ এত অধিক যে এটা গোপন রাখা অসম্ভব। আরও আশ্চর্যের বিষয় ইউযু আসফের পুরাতন ধর্ম গ্রন্থের সাথে (যা অধিকাংশ বিজ্ঞ ইংরেজ পন্ডিতদের মতে যিশুখ্রিষ্টের জন্মের পূর্বেই লিখিত হয়েছিল এবং যা বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়ে নানা দেশে প্রচারিত হয়েছে) বাইবেলের অধিকাংশ কথায় এত সামঞ্জস্য আছে যে বহু স্থানে বর্ণনাগুলোতে বাক্যসমূহ এর সাথে সম্পূর্ণ একরূপ। বাইবেলে বর্ণিত উপাখ্যানসমূহ অক্ষরে অক্ষরে উক্ত পুস্তকেও বর্ণিত আছে। মূর্খতায় কেউ অন্ধ প্রায় হলেও বিশ্বাস করবে উক্ত পুস্তকের অবিকল বর্ণনাই অপহৃত হয়ে ইঞ্জীলে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। কিন্তু এটা স্বীকার করলে ইঞ্জীলের আর কিছুই বাকী থাকে না। নাউযুবিল্লাহ্, হযরত ঈসা তাঁর সমস্ত শিক্ষায় অপহরণকারী বলে প্রমাণিত হন। এ পুস্তক এখনও মজুদ আছে। কেউ ইচ্ছা করলে দেখতে পারেন। কিন্তু আমার মতে এটা ঈসা (আ:)-এর ভারত ভ্রমণ লিখিত ইঞ্জীল ও অন্যান্য ইঞ্জীল অপেক্ষা সুরক্ষিত ও পবিত্র। কিন্তু কোন কোন ইংরেজ সুবিজ্ঞ মহাপন্ডিত, একে বুদ্ধের প্রণীত পুস্তক বলে নির্দেশ করে নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করেছেন, যা হযরত ঈসা (আ:)-কে চোর সাব্যস্ত করে।

এটা স্মরণ রাখা অবশ্য কর্তব্য, পাদ্রী সাহেবদের ধর্মগ্রন্থগুলো এমনই দুরবস্থায় পতিত যে তা প্রকাশ করতেও লজ্জাবোধ হয়। তারা শুধু নিজেদের হঠকারিতায় কতগুলো ধর্মগ্রন্থকে স্বর্গীয় ধর্মগ্রন্থ ও কতগুলোকে কৃত্রিম বলে নির্দেশ করেন। তাঁরা চারটি ইঞ্জীলকে মূল ও সত্য বলে নির্দেশ করেন এবং শুধু কল্পনা ও সন্দেহের বশবর্তী হয়ে অবশিষ্ট প্রায় ৫৬ খানা ইঞ্জীলকে কৃত্রিম বলে প্রচার করেন।কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁদের কাছে কোন প্রমাণ নেই। প্রচলিত ইঞ্জীল ও অন্যান্য ইঞ্জীলে অনৈক্য দেখা যায় বলে তাঁরা নিজেদের মতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। কিন্তু সমালোচক পণ্ডিতগণ বলেন, এ ইঞ্জীলসমূহ কৃত্রিম কি সেই ইঞ্জীলসমূহ কৃত্রিম তা আমরা সঠিক বলতে পারি না। তজ্জন্যই সম্রাট এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেককালে, লন্ডনের প্রাদ্রীগণ যেসব ইঞ্জীলকে লোকেরা কৃত্রিম বলে ধারণা করে, সেইগুলোকে প্রচলিত চারটি ইঞ্জীলের সাথে একত্র করে একই গ্রন্থে বাঁধাই করে তাঁকে উপঢৌকন দিয়েছিলেন। এ সংগৃহীত গ্রন্থের এক কপি আমার কাছে মজুদ আছে। অতএব চিন্তার বিষয়, উক্ত ইঞ্জীলসমূহ যদি প্রকৃত পক্ষেই অপ্রকৃত ও কৃত্রিম হতো, তবে পবিত্র ও অপবিত্র পুস্তকসমূহ একই গ্রন্থরূপে বাঁধাই করায় অনেক বড় পাপাচার অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফলত এরা সন্তোষজনকভাবে কোন গ্রন্থকেই মৌলিক বলে নির্দেশ করতে পারেন না। তারা শুধু নিজেদের মতে এ মীমাংসায় উপনীত হয়েছেন এবং ঐকান্তিক অন্ধবিশ্বাস ও হঠকারিতাবশত কুরআন শরীফের অনুকূল ইঞ্জীলগুলোকেই কৃত্রিম বলে প্রকাশ করেন। বার্ণাবাসের ইঞ্জীল (যাতে শেষ যুগের নবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আগমন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী লেখা আছে), শুধু এ কারণেই কৃত্রিম বলে নির্দেশ করা হয়েছে যে এতে হযরত (সঃ) সম্বন্ধে অতি স্পষ্ট ভাষায় ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। সেল সাহেব তাঁর অনূদিত ইংরেজী কুরআনে এক খ্রিষ্টান সাহেবের (সন্ন্যাসীর) ইঞ্জীল পাঠ করে ইসলাম গ্রহণের বিবরণ লিখে গেছেন। বস্তুত তাঁরা যেসব ইঞ্জীলকে কৃত্রিম বলে নির্দেশ করেন, নিম্নলিখিত দু'কারণেই সেগুলোকে কৃত্রিম মনে করেন : (এক) এ বিবরণী ও পুস্তকগুলো প্রচলিত চার ইঞ্জিলের অনুরূপ নয়। (দুই) এ বিবরণী ও পুস্তকগুলো কুরআনের সাথে কিছু পরিমাণে অনুরূপ। কোন কোন অসাধু ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়ের মানব এ পুস্তক কৃত্রিম– এ কথা সর্বদাবীসম্মত বলে কল্পনা করে[৪] বলে, এ কৃত্রিম পুস্তকের বিবরণীই কুরআনে লেখা রয়েছে এবং এরূপে অজ্ঞলোকদেরকে প্রতারণা

৪. খ্রিষ্টান ধর্মমতে স্বধর্মের সহায়কল্পে সব ধরনের অপবাদ ও মিথ্যাকথা অনুমোদিত ও পুণ্যকর্ম বলে উল্লেখিত (পৌলের বাক্য দ্রষ্টব্য)।

করে। বাস্তবিক তৎকালীন কোন ধর্মশাস্ত্র কৃত্রিম কি মৌলিক, খোদার নতুন ওহী বা প্রত্যাদেশবাণী ছাড়া সঠিকভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব। খোদার ওহীতে যে বিবরণী সত্য বলে প্রকাশিত, অজ্ঞ মানব তা মিথ্যা বলে নির্দেশ করলেও তা-ই প্রকৃতপক্ষে সত্য। খোদার কথায় যা মিথ্যা বলে প্রকাশিত তা মিথ্যা।

কেউ কুরআন সম্বন্ধে যদি এধারণা পোষণ করে, এর ঐতিহাসিক বিবরণী ও উপাখ্যানসমূহ ইঞ্জীল হতে সংগ্রহ করা হয়েছে, তবে এটা তার পক্ষে অত্যন্ত লজ্জাজনক মূর্খতা হবে। পবিত্র ও স্বর্গীয় গ্রন্থে কি কোন পুরাকালীন বিবরণী সন্নিবেশিত থাকতে পারে না? দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন হিন্দুদের বেদগ্রন্থেরও (যা কুরআন অবতীর্ণ হবার যুগে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত গ্রন্থ ছিল) কোন কোন সত্য বাণী কুরআনে দেখতে পাওয়া যায়। তবে কি আমরা মনে করতে পারি, হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বেদও পাঠ করেছিলেন? মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে বাইবেল এখন সুলভ ও সুপরিচিত হলেও, প্রাচীন আরবগণ এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল। তারা ছিল সম্পূর্ণ নিরক্ষর জাতি। যদিও তাদের দেশে কখনো কোন খ্রিষ্টান বাস করতো তবে তারও স্বধর্মের বিস্তারিত জ্ঞান ছিল না[৫]। সুতরাং এ অপবাদ যে হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এসব পুস্তক হতে অপহরণ করে এ বিবরণীসমূহ কুরআন শরীফে লিখিয়েছিলেন, এক মহা অভিশাপজনক অপবাদ! আঁ হযরত (স:) ছিলেন সম্পূর্ণ নিরক্ষর। গ্রীক ও হিব্রু ভাষার জ্ঞান তো দূরের কথা, মাতৃভাষা আরবীও তিনি পড়তে জানতেন না।

সেকালের কোন্ প্রাচীন গ্রন্থ হতে বর্ণনা অপহরণ করা হয়েছিল এর প্রমাণ আবশ্যক। আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীকেই এ প্রমাণ দিতে হবে। অসম্ভবকে যদি সম্ভব মনে করে কল্পনা করে নেয়া হয় যে কোন কোন অপহৃত বিষয় কুরআনে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল,তবে জিজ্ঞাস্য এই, ইসলাম ধর্মের পরম শত্রু আরব খ্রিষ্টানগণ কেন তখন নিঃশব্দ হয়ে নিশ্চেষ্ট অবস্থায় বসে ছিল? তারা কেন তৎক্ষণাৎ চীৎকার করে বলে উঠল না, 'আমাদের গ্রন্থ হতেই অপহরণ করে ও আমাদের কাছেই শ্রবণ করে এসব বাক্য কুরআনে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে?' এটা স্মরণ রাখা অবশ্য কর্তব্য, শুধু কুরআনই নিজেকে মানবশক্তি বহির্ভূত অলৌকিক গ্রন্থ বলে জোর দাবি করছে এবং প্রবল প্রতাপে ঘোষণা করছে[৬] এর যাবতীয়

---

৫. আরবের খ্রিষ্টানগণ পশুর ন্যায় ও সম্পূর্ণ অন্ধ ছিল, পাদ্রী ফিন্ডেল সাহেব তাঁর লেখা 'মীযানুল হক'-এ এটা স্বীকার করেছেন।

৬. কুরআন শরীফ নিজেকে অলৌকিক ও অদ্বিতীয় বলে দাবি করত উচ্চস্বরে ঘোষণা করেছে, কুরআনের বাণী কোন মানবের বাণী বলে কারও মনে যদি সন্দেহ হয়, তবে জগতে যে কোন মানব

ঐতিহাসিক বিবরণী ও উপাখ্যান ওহী বা ঐশী বাণী। এতে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত যাবতীয় বিষয় ভবিষ্যদ্বাণীরূপে লিপিবদ্ধ আছে। সুকথা ও বাগ্মিতা সম্বন্ধে এটা মানবশক্তি বহির্ভূত অলৌকিক পুস্তক। অতএব তৎকালীন খ্রিষ্টানগণ সহজেই কোন কোন গল্পকাহিনী ও বিবরণী কুরআন থেকে উদ্ধৃত করে দেখাতে পারতেন তাদের অমুক অমুক পুস্তক ও ধর্মগ্রন্থ হতে অপহরণ করে এ বিষয়গুলো কুরআনে সন্নিবেশ করা হয়েছে। এ পুস্তকগুলো মৌলিক ধর্মগ্রন্থ হোক বা কৃত্রিম ধর্মগ্রন্থ হোক, আরবী খ্রিষ্টানগণ তা অপ্রকাশিত রেখে চুপ করে বসে ছিল, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই এমন কথা স্বীকার করতে সমর্থ নয়। অতএব কুরআনের যাবতীয় বিবরণীই যে ঐশীবাণী এতে কোন সন্দেহ নেই। এ ঐশীবাণীর অবতরণ এত বড় অলৌকিক কার্য যে কেউই এর সমকক্ষতা লাভে সমর্থ হয় নি। এটাও নিশ্চয় ভেবে দেখার বিষয়, যে ব্যক্তি পরের পুস্তক হতে বর্ণনা চুরি করে তাঁর গ্রন্থ সঙ্কলন করেছিল এবং স্বয়ং অবগত ছিল যে অমুক অমুক পুস্তক হতে অমুক অমুক বিষয় ও বর্ণনা উদ্ধৃত করা হয়েছে আর এগুলো ঐশীবাণী নয় তিনি কিরূপে সারা পৃথিবীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করতে দুঃসাহসী হলেন? প্রতিদ্বন্দ্বীগণই বা কেন এ কাজে অগ্রসর হতে সাহস করলো না? বস্তুত সত্য কথা এই, খ্রিষ্টানগণ কুরআনের ওপর বড়ই বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট। তাদের বিরাগ ও অসন্তোষের কারণ এ কুরআন খ্রিষ্টধর্মের যাবতীয় ডানা ও পালক ছিঁড়ে ফেলেছে। কোন মানবের পক্ষে স্বয়ং খোদা হওয়া যে সম্পূর্ণ অলীক ও অসম্ভব, তা স্পষ্টরূপে দেখিয়ে দিয়েছে। খ্রিষ্টানদের ক্রুশ সম্বন্ধীয় বিশ্বাসগুলোকে সম্পূর্ণরূপে খন্ডন করেছে। বাইবেলের যে নৈতিক শিক্ষা নিয়ে খ্রিষ্টানগণ এত গর্ব করতেন তা এককভাবেই অসম্পূর্ণ ও অচল বলে প্রতিপন্ন করেছে। কাজে কাজেই খ্রিষ্টানরা তাদের স্বার্থহানি দেখে ক্ষেপে উঠেছে এবং অসংখ্য মিথ্যা কথা বলছে। মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হয়ে নব যৌবন লাভ করত পুনরায় মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে আদিম শুক্রে পরিণত হবার আকাঙ্ক্ষা করা আর কোন মুসলমানের খ্রিষ্টান হবার আকাঙ্ক্ষা করাও একই কথা।

এরূপ বাণী প্রচার করে এর প্রতিযোগিতা করুক। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীগণ সবাই নিঃশব্দ থেকে কুরআনের নির্দোষিতা ও পবিত্রতাকে প্রতিপন্ন করেছেন। কিন্তু ইঞ্জীলকে তৎকালীন ইহুদীগণ চুরির মাল বলে নির্দেশ করেছেন। ইঞ্জীলে এমন দাবিও নেই যে মানুষ এমন গ্রন্থ প্রণয়ন করতে অসমর্থ। সুতরাং চুরির কথা ইঞ্জীল সম্বন্ধে সম্ভবপর হলেও কুরআন শরীফ সম্বন্ধে কখনো সম্ভবপর নয়। কুরআনের দাবিই এই– কোন মানুষই এমন গ্রন্থ প্রণয়ন করতে কক্ষনো সক্ষম হবে না। প্রতিদ্বন্দ্বীরা সবাই নিঃশব্দ থেকে এ দাবির সত্যতা প্রতিপন্ন করেছেন।

বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, খ্রিষ্টানগণ কী নিয়েই বা গর্ব করেন। তাদের কোন খোদা যদি থেকে থাকে, তবে তিনিও বহু শতাব্দী পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে, কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর শহরে খান ইয়ার স্ট্রিটে মাটির নিচে কবরে সমাহিত আছেন। আর তাঁর যদি কোন অলৌকিক কার্য ও ঘটনা থেকে থাকে, তবে তা-ও অন্য নবীগণের অলৌকিক ক্রিয়া ও ঘটনা অপেক্ষা শ্রেয় নয়। বরং ইলিয়াস নবীর মু'জিযা হলো ঈসা নবীর মু'জিযা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর ইহুদীদের বর্ণনা মতে তাঁর কোন অলৌকিক ক্রিয়া ও ঘটনাই ছিল না। তিনি শুধু মিথ্যা বলেছেন ও প্রতারণা করেছেন।[৭] আর তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর অবস্থা এই, ওগুলোর অধিকাংশই মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাঁর ১২ জন হাওয়ারী কি স্বর্গে ১২টি সিংহাসন পেয়েছিলেন? কেউ এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন কি? যে পার্থিব রাজত্বের জন্য অস্ত্রশস্ত্র পর্যন্ত ক্রয় করা হয়েছিল, তা কি তিনি লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন? কেউ এর উত্তর দিন তো? যিশু কি তাঁর অঙ্গীকার মতে সে যুগেই আকাশ হতে অবতরণ করেছিলেন? আকাশ হতে অবতরণ করা তো দূরের কথা, আকাশে আরোহণ করাও তাঁর ভাগ্যে ঘটে নি।[৮] ইউরোপীয় সমালোচক পন্ডিতগণেরও এই মত : তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে অর্ধমৃত অবস্থায় বেঁচে ছিলেন। এরপর অতি সংগোপনে পলায়ন করে ভারতবর্ষের পথ ধরে কাশ্মীরে উপনীত হয়েছিলেন এবং সেখানে মারা গিয়েছিলেন।

ইঞ্জীলের শিক্ষার অবস্থা খুবই শোচনীয়। অপহরণ যে দোষের তা ছেড়ে দিলেও দেখা যায়, মানবের মনোবৃত্তির মাঝে কোন একটি মাত্র মনোবৃত্তি অর্থাৎ ক্ষমা ও

---

৭. ইহুদীরা তাদের এ কথায় স্বয়ং যিশুর বাক্য হতেই সহায়তা পায়। তিনি ইঞ্জীলে বলেছেন, এ যুগের হারামখোরগণ (অসাধু ও পাপী পুরুষরা) আমার সমীপে নিদর্শন চায়, তাদেরকে কোন নিদর্শনই দেখান হবে না। অতএব তিনি যদি কোন মু'জিয়া দেখাতেন তবে নিশ্চই তাদের প্রার্থনাকালে এর উল্লেখ করতেন।

৮. যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়া সত্ত্বেও ঈসা (আ:)কে জড়দেহে স্বর্গে উত্তোলন করেন, তাঁরা কুরআনের প্রতিকূলে অনর্থক বাক্য উচ্চারণ করেন। কুরআন শরীফে *ফালাম্মা তাও-য়াফ্ফায়তানী* (সূরা মায়েদা : ১১৮) আয়াতে ঈসা নবীর মৃত্যু ঘোষণা করা হয়েছে এবং *হালকুনতু ইয়া বাশারার্রসূলা* (সূরা বনী ইসরাঈল : ৯৪) আয়াতে কোন মানবের পক্ষে জড়দেহে স্বর্গারোহণ করা অসম্ভব বলে প্রচার করা হয়েছে। খোদার কালামের প্রতিকূল বিশ্বাস পোষণ করা বড় মূর্খতা। *তাওয়াফ্ফি* অর্থ জড়দেহে স্বর্গারোহণ এ অপেক্ষা অধিক মূর্খতা আর কি! প্রথমত কোন অভিধানেই *তাওয়াফ্ফি* অর্থ জড় দেহে স্বর্গারোহণ করা এরূপ পাওয়া যায় না। আবার যেমন *ফালাম্মা তাওয়াফ্ফায়তানী* আয়াত কিয়ামত সম্বন্ধে বলা হয়েছে অর্থাৎ রোজ কিয়ামতে হযরত ঈসা খোদা তাআলাকে এ উত্তর দিবেন। তখন এ অর্থ করলে স্বীকার করতে হয়, পুনরুত্থান দিবস এসে পৌছলেও ঈসা নবী মরবেন না। মৃত্যুর পূর্বেই জড়দেহে খোদার সামনে হাজির হবেন। কুরআন শরীফের এরূপ তহ্রীফ ও অর্থ পরিবর্তন ইহুদীদের তহ্রীফ অপেক্ষাও গুরুতর।

ধৈর্য গুণের উন্নতির ওপরই ইঞ্জীলে বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে। কিন্তু বাকী মনোবৃত্তিকে একেবারেই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে। আপনারা সবাই অবশ্যই জানেন, সর্বশক্তিমান খোদা তাআলা মানবকে যা দিয়েছেন এর কিছুই অনর্থক ও উদ্দেশ্যহীন নয়। প্রতিটি মানবীয় শক্তিই নিজ নিজ স্থানে বিশেষ বিশেষ কল্যাণজনক কাজে ও উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হয়েছে। সময় ও অবস্থা বিশেষে ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা যেমন উত্তম চরিত্রগুণ বলে গণ্য হয় তেমনি প্রতিশোধ, শাস্তি দান ও অধৈর্য হয়ে যাওয়াও উত্তম চরিত্র গুণে পরিণত হয়। সব সময় ক্ষমা দেখানো ও ধৈর্য অবলম্বন কল্যাণজনক নয়। সব সময় শাস্তি দেওয়াও সুফল বয়ে আনে না।

কুরআনে খোদা তাআলা যে মহানীতি শিখিয়েছেন তা বাস্তবিক কল্যাণজনক ও সুফলপ্রদ– *যাজাউস্ সাইয়্যিআতিন সাইয়্যিআতুম্ মিছ্লুহা ফামান 'আফা ওয়া আসলাহা ফাআজরুহূ আলাল্লাহ্* অর্থাৎ যে পরিমাণ কুকর্ম (করা হয়) প্রতিফল ঠিক সেই পরিমাণেই (দিতে হয়), কিন্তু যে ব্যক্তি ক্ষমা করে ও তা দিয়ে পরোপকার ও দোষ সংস্কার করে, সে খোদার সমীপে পুরস্কার পায়।[৯] এটাই কুরআনের শিক্ষা। কিন্তু ইঞ্জীলে সর্বত্রই অহেতুক ক্ষমা প্রদর্শন করতে ও ধৈর্য অবলম্বন করে থাকতে বিশেষ অনুশাসন লিপিবদ্ধ আছে। যে মনোবৃত্তি বিকাশের ওপর মানব সভ্যতা সংস্থাপিত ইঞ্জীলে একে পদদলিত করা হয়েছে। মানব-তরুর সব শাখা একটি শাখার উন্নতি সাধনে বিশেষ জোর দিয়ে অবশিষ্ট শাখাগুলোর উন্নতি বিধানের কাজ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা হয়েছে। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই, যিশু তাঁর নিজ নৈতিক শিক্ষানুসারেও জীবন যাপন করতে সমর্থ হন নি। তিনি ডুমুর ফল খাবার জন্য ডুমুর গাছের কাছে গিয়ে তা ফলহীন পেয়ে অভিসম্পাত করেছেন। তিনি পরকে আদর্শবাদ শিক্ষা দিয়েছেন এবং আদেশ করেছেন, 'কাহাকেও নির্বোধ কহিও না'। কিন্তু স্বয়ং কুবাক্য প্রয়োগে এত উন্নতি করেছেন যে ইহুদীদের নেতৃগণকে 'জারজ সন্তান' বলেছেন এবং তাদেরকে অতি নিন্দিত আখ্যায় আখ্যায়িত করেছেন। কার্যত সুনীতি দেখানো নৈতিক শিক্ষকের অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু যে অপূর্ণ শিক্ষানুসারে তিনি স্বয়ং জীবন যাপন করতে সমর্থ হন নি তা কি কখনো ঈশ্বরপ্রদত্ত শিক্ষা হতে পারে? ফলত পূর্ণ ও পবিত্র শিক্ষা শুধু কুরআনের শিক্ষা। কুরআন মানবতরুর যাবতীয়

৯. অনর্থক ক্ষমা করা ও অপরাধীকে ছেড়ে দেয়া, কুরআন শরীফে অনুমোদিত নয়। কেননা, এতে মানব চরিত্র বিকৃত হয়। সামাজিক শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। সামাজিক বন্ধন ভঙ্গ হয়। যে প্রকার ক্ষমায় কোন উপকার বা সংস্কার সাধন হয় তা-ই কুরআনে অনুমোদিত (সূরা শূরা : ১৪)।

শাখাপ্রশাখার প্রতিপালন করে। কুরআন শুধু একদিকেই জোর দেয় না। সময় ও স্থান বিশেষে কুরআন ক্ষমা ও ধৈর্য শিক্ষা দেয় বটে, কিন্তু এ দিয়ে উপকার সাধন করতে হবে, এ শর্তও রেখে দেয়। সময় ও স্থান বিশেষে অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থাও কুরআন শরীফে বিদ্যমান। অতএব জগতের চির পরিদৃষ্ট অটল ও অনন্ত ঐশ্বরিক নিয়মাবলীর অনুরূপ প্রতিবিম্ব শুধু কুরআন শরীফেই দেখা যায়। ঐশ্বরিক বাণী ও ঐশ্বরিক কাজে যে সামঞ্জস্য আছে তা মানব বুদ্ধিতে অবশ্য স্বীকার্য। ঐশ্বরিক কাজ যে ভাবাপন্ন ও যে বর্ণবিশিষ্ট ঐশ্বরিক বাণীও ঠিক সেই ভাবাপন্ন ও বর্ণবিশিষ্ট হবে, পরমেশ্বরের বাণী পূর্ণ সত্যগ্রন্থে তাঁর কার্যের অনুরূপ শিক্ষা বর্তমান থাকবে। কথায় একরূপ ও কাজে অন্যরূপ হওয়া খোদা তাআলার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমরা ঐশ্বরিক কাজগুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখতে পাই, তিনি সদাসর্বদা ক্ষমা ও ধৈর্য প্রদর্শন না করে পাপীদেরকে বিভিন্ন প্রকারে শাস্তি দেন; এরূপ শাস্তির বিবরণ পূর্ববতী পুরাতন ধর্মগ্রন্থাবলীতেও পাওয়া যায়। পরমেশ্বর শুধু ক্ষমাশীল পরমেশ্বর নন তিনি ক্ষমাশীলও বটে, কঠোর শাস্তিদাতাও বটে। যে গ্রন্থ্ তাঁর অটল স্বাভাবিক নিয়মাবলীর অনুকূল তাই সত্যগ্রন্থ্। যে ঐশ্বরিক বাণী ঐশ্বরিক কাজের প্রতিকূল নয়, তা-ই সত্য ঐশ্বরিক বাণী। আমরা কখনো এমন নিয়ম দেখতে পাই নি যে পরমেশ্বর সব সময়ই মানবজাতির প্রতি ক্ষমা ও ধৈর্য প্রদর্শন করেন। অপবিত্র চরিত্র মানবের শাস্তির নিমিত্তে খোদা তাআলা এই মাত্র আমার দ্বারা এক মহা ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের আগমন সংবাদ প্রদান করে রেখেছেন। এ ভূমিকম্প এদেরকে ধ্বংস করবে। এদিকে প্লেগ মহামারী এখনও এদেশ হতে দূরীভূত হয় নি। ইতিপূর্বে অতীত যুগে নূহের জাতির লোকদের কী দুর্দশা হয়েছিল! লূতের স্বদেশবাসীগণের কী ভীষণ বিপদ ঘটেছিল! অতএব নিশ্চয় জানবে শরীয়তের (স্বর্গীয় বিধানের) মূখ্য উদ্দেশ্য *তাখাল্লাকু বি আখলাকিল্লাহ্* অর্থাৎ মহাসম্মানিত ও প্রবল প্রতাপান্বিত খোদা তাআলার চরিত্রের আলোকে চরিত্র গঠন। এতেই মানবের পুর্ণতাপ্রাপ্তি ও সিদ্ধিলাভ হয়। আমরা যদি আল্লাহ্ তাআলার চরিত্রকে অতিক্রম করে কোন সদাচরণ করতে কিংবা সচ্চরিত্র গঠন করতে অভিলাষী হই তবে তা-ই অধর্ম ও কালিমাময় চরিত্র ও ধৃষ্টতা এবং খোদা তাআলার চরিত্রের বিরুদ্ধে ভীষণ প্রতিবাদ বলে পরিগণিত হবে।

আবার এ কথাও ভেবে দেখুন! তওবা, অনুশোচনা ও ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি অপরাধীকে ক্ষমা করেন, পুণ্যবানদের সুপারিশ ও বিশেষ অনুরোধেও প্রার্থনা মঞ্জুর করেন, অনন্তকাল থেকে খোদার প্রাকৃতিক নিয়ম এটাই। কিন্তু যায়েদের

মাথায় পাথর মারলেই বকরের মাথা বেদনা দূর হয়ে যায়– আমরা খোদার এমন প্রাকৃতিক নিয়ম কখনো দেখিনি। অতএব ঈসা মসীহের আত্মহননে পরের রোগ দূরীভূত হওয়ার কথা কোন্ নিয়মের ওপর সংস্থাপিত এবং কোন্ দার্শনিক সত্যের বলে মসীহের রক্তে পরের অভ্যন্তরীণ কলঙ্ক ও কালিমা দূরীভুত হবে তা আমরা বুঝতে পারি না। বরং আমরা এর প্রতিকূল রীতিই দেখতে পাই। কেননা, মসীহ্ যতদিন আত্মহত্যা করতে মনস্থ করেন নি ততদিন খ্রিষ্টান সমাজে সদাচরণ ও ঈশ্বরের উপসনার বীজ বর্তমান ছিল। কিন্তু ক্রুশের ঘটনার পর থেকে খ্রিষ্টানদের অহমিকাস্রোত বাঁধ ভাঙ্গা নদীর ন্যায় চারদিকে পাড় ডুবিয়ে বয়ে যাচ্ছে। মসীহ্ যদি এ আত্মহত্যা নিজ ইচ্ছায় করে থাকেন তবে তিনি যে খুবই অন্যায় করেছেন এতে কোন সন্দেহ নেই। এ জীবন যদি বক্তৃতা করে ও উপদেশ দিয়ে কাটাতেন তাহলে খোদার সৃষ্ট জীবদের উপকার করতেন। এ অসঙ্গত ধৃষ্টতায় কি পরোপকার হয়েছে? অবশ্য মসীহ্ আত্মহননের পর জীবিত হয়ে ইহুদীদের সামনে যদি সশরীরে স্বর্গারোহণ করতেন তবে ইহুদীরা বিশ্বাস করতো। কিন্তু এখনও তো ইহুদীদের মতে ও বুদ্ধিমানদের মতে ঈসার স্বর্গারোহণ শুধু কাল্পনিক গল্প মাত্র।

আবার ত্রিত্ববাদও এক অদ্ভুত বিশ্বাস। কেউ কি কখনো শুনেছে, সম্পূর্ণ স্বাধীন ও পরিপূর্ণ সত্তা তিন হয় আবার একও হয় এবং এক পরিপূর্ণ খোদা তিন পরিপূর্ণ খোদা হয়। খ্রিষ্টান ধর্ম যে এর প্রতি কথায় ভুলত্রুটি এবং প্রতিটি বিষয়ে অপলাপ বিদ্যমান। আবার এত আঁধার সত্ত্বেও ভবিষ্যতের জন্য ওহী ও ইলহাম একেবারে মোহরাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। এখন ইঞ্জীলে ভ্রান্তিগুলোর মীমাংসা খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস মতে নতুন ওহী ও ইলহামের মাধ্যমেও অসম্ভব। কেননা, তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী ভবিষ্যতে ওহীর সম্ভাবনা নেই। সব অতীতে হয়ে গেছে। এখন সব ভরসা কেবল নিজ নিজ সিদ্ধান্তের ওপর। এ সিদ্ধান্ত যদিও অজ্ঞতা, সন্দেহ ও অন্যান্য কালিমা থেকে মুক্ত নয়। তাদের ইঞ্জীল অগণিত জ্ঞানবিরুদ্ধ এবং অহেতুক কথায় পরিপূর্ণ। তারা বলে, ইঞ্জীলের মতে দুর্বল মানুষ যীশুই পরমেশ্বর। পরের পাপে তিনি ক্রুশবিদ্ধ, ৩ দিন ধরে নরকে পরিত্যক্ত। তিনি স্বয়ং পরমেশ্বর অথচ দুর্বল ও মিথ্যাবাদী। ইঞ্জীলে এসব কথা পাওয়া যায় যাতে নাউযুবিল্লাহ্ (আমরা এথেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাচ্ছি) হযরত ঈসা মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হন। তিনি এক চোরকে বলেছিলেন, 'তুমি আজ স্বর্গে আমার সাথে ভোজন করবে'। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করে তিনি সেদিন নরকে চলে যান। ৩ দিন অবিরত কঠোর নরক যাতনা ভোগ করলেন। 'শয়তান যিশুকে

পরীক্ষা করতে কয়েক জায়গায় নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছিল’ একথাও ইঞ্জীলে লেখা আছে। আশ্চর্যের বিষয়, স্বয়ং পরমেশ্বর হয়েও যিশু পাপী-সত্তা শয়তানের পরীক্ষা থেকে নিস্তার পেলেন না। শয়তান পরমেশ্বরকেও পরীক্ষা করতে ও বিপথগামী করতে সাহসী হলো! ইঞ্জীলের দার্শনিক জ্ঞান গোটা পৃথিবী থেকে একেবারে আলাদা। শয়তান বাস্তবিকই যদি তাঁর কাছে আগমন করেই থাকতো তবে ইহুদীদেরকে দেখিয়ে দেয়ার জন্য এটা কি একটি মহা সুযোগ ঘটেছিল না? মালাকি নবীর ধর্ম গ্রন্থে আছে, মসীহ্ আবির্ভূত হওয়ার আগে ইলিয়াস নবী স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে পুনরাগমন[১০] করবেন। এটাই মসীহ্র আগমনের নিদর্শন। কিন্তু ইলিয়াস নবী পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেন না বলেই ইহুদীরা ঈসা নবীকে অস্বীকার করে এবং আজ পর্যন্ত তাঁকে ভন্ড নবী, মিথ্যা নবী ও প্রতারক বলে নির্দেশ করে। এ প্রবল যুক্তির প্রতিবাদে খ্রিষ্টানরা নীরব। ঈসার সমীপে শয়তানের আগমন সংবাদও তাদের মতে পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। অনেক পাগল এরূপ শয়তানী স্বপ্ন দেখে থাকে। এটা ‘কাবুস’ বা বোবায় ধরা জাতীয় রোগ বিশেষ। এক সমালোচক পন্ডিত শয়তানের আগমনের ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন: মসীহের কাছে ৩ বার শয়তানী ইলহাম (প্রত্যাদেশ বাণী) অবতীর্ণ হয়েছিল। ‘তুমি পরমেশ্বরকে পরিত্যাগ করে পরিপূর্ণভাবে আমার অনুচর হও।’ এটাও তার একটি শয়তানী ইলহাম। সে এ কথা তাঁর অন্তরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। ঈশ্বরপুত্রের ওপর শয়তান নিজ প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হলো এবং সংসারের প্রতি তাঁরও হৃদয় আকৃষ্ট করতে সক্ষম হলো এটা বড়ই আশ্চর্যের বিষয়!

ঈশ্বরত্বের একেবারে প্রতিকুল ভাবাপন্ন হয়ে তিনি আবার মারাও গেলেন। পরমেশ্বর কাখনো কি মারা যান? আর শুধু যদি মানুষই মরে গিয়ে থাকেন তবে ঈশ্বরপুত্র মানব জাতির উদ্ধারের জন্য প্রাণ ত্যাগ করেছেন, এ দাবী কেন? ঈশ্বর পুত্র বলে কথিত হওয়া সত্ত্বেও পুনরুত্থান দিবস সম্বন্ধে তিনি কোন সংবাদ রাখেন নি। তিনি বাইবেলে স্বীকার করেছেন, ঈশ্বর পুত্র হওয়া সত্ত্বেও কিয়ামত কবে

---

১০. বর্তমানে আমাদের সহজ সরল মোল্লা মৌলভীগণ যেমন হযরত ঈসা (আ:)-এর আকাশ থেকে অবতরণের অপেক্ষা করেন সেভাবে সেই যুগের ইহুদীরা ইলিয়াস নবীর আকাশ থেকে অবতরণের প্রতীক্ষা করতো। হযরত ঈসা (আ:) মালাকি নবীর সেই ভবিদ্বাণীর রূপকভাবে ব্যাখ্যা করলেন। তাই ইহুদী জাতি আজ পর্যন্ত তাঁকে সত্য নবী মানে না। কেননা ইলিয়াস আকাশ থেকে অবতরন করেন নি। এ বিশ্বাসের দরুনই ইহুদী সমাজ অভিশপ্ত হয়েছে। আজকাল মুসলমান এ বৃথা আশার মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে ইহুদীদের রঙ্গে রঙ্গীন হয়েছে। যাহোক এতে হযরত মুহাম্মদ (স:)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পুর্ণ হয়েছে।

সংঘটিত হবে তা তিনি জানেন না। স্বয়ং পরমেশ্বরেরও পুনরুত্থান দিবসের জ্ঞান নেই, এটা কেমন অলীক ও অসঙ্গত কথা! কিয়ামত দিবস তো দূরের কথা ডুমুর গাছের কাছে যাওয়ার সময়ে সেই গাছে যে ফল নেই তা-ও তিনি জানতেন না।

এখন আমি মূল বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করে সংক্ষেপে বলতে চাই, কোন ঐশী বাণী যদি কোন অতীত কাহিনী বা গ্রন্থের সম্পূর্ণ বা আংশিক অনুরূপ ও অনুকূল হয়ে অবতীর্ণ হয় কিংবা তা মানুষের মতে যদি কাল্পনিক কাহিনী বা কাল্পনিক গ্রন্থ হয় তথাপি উক্ত ঐশী বাণীর বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গতভাবে কোন আক্রমণ করা যায় না। খ্রিষ্টানরা যে পুস্তকগুলোকে ঐতিহাসিক বলে উল্লেখ করেন অথবা যেগুলোকে ঐশী বাণীপূর্ণ ধর্মগ্রন্থ বলে নির্দেশ করেন, ওগুলোর সত্যতা সম্বন্ধে তাদের সব কথা অলীক, ভিত্তিহীন ও প্রমাণবিহীন। কোন পুস্তকই সন্দেহ ও দ্বিধা হতে মুক্ত নয়। যে গ্রন্থগুলোকে তারা সত্য বলে বিশ্বাস করেন সেগুলো কৃত্রিম না-ও হতে পারে। যে গ্রন্থগুলোকে তারা সত্য বলে বিশ্বাস করেন সেগুলো কৃত্রিমও হতে পারে। ঐশী গ্রন্থগুলোর অনুকূল অথবা প্রতিকূল হওয়া আবশ্যকীয় নয়। এ বিশেষ গ্রন্থগুলোর অনুকূল কিংবা প্রতিকূল হওয়া ঐশী গ্রন্থের সত্যতার লক্ষণ নয়। খ্রিষ্টানরা আদালতের বিচার প্রণালী অনুসারে বিচার করে সেই পুস্ত কগুলোকে কৃত্রিম বলতে পারেন না। কোন নিয়মিত প্রমাণের ওপর নির্ভর করে সত্য ও বিশুদ্ধ বলেও নির্দেশ করতে পারেন না। তারা শুধু যুক্তিহীন ঝগড়া বিবাদ ও নিজ নিজ কল্পনা ও খেয়াল নিয়েই ব্যস্ত। অতএব তাদের এ অসার চিন্তাধারা দিয়ে ঐশীগ্রন্থের সত্যতা পরীক্ষা করা অসম্ভব। ঐশী ধর্মগ্রন্থ অবশ্য পরমেশ্বরের অটল প্রাকৃতিক নিয়ম[১১] ও অলৌকিক কাজে ঈশ্বর কর্তৃক এর প্রণয়ন সপ্রমাণ করতে সক্ষম হবে। অতএব ঐশী গ্রন্থের সত্যতা পরীক্ষা করতে চাইলে এটা দেখে নেয়া আবশ্যক হবে। আমাদের প্রভু ও নেতা হযরত মুহাম্মদ (স:)-এর তিন হাজার অপেক্ষা অধিক সংখ্যক মু'জিযা (অলৌকিক কাজ) ছিল। আর তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর সংখ্যা অগণিত। তাঁর অতীত অলৌকিক কাজের বর্ণনা অনাবশ্যক। অন্যান্য নবী ও রসূলগণের ওহী বা আকাশবাণী বন্ধ হলেও তাঁদের অলৌকিক কাজ বিদ্যমান না থাকলেও তাঁদের অনুসরণ এখন পুরোপুরি খালি

---

১১. মানবহৃদয়ে কতগুলো প্রাকৃতিক নিয়ম অঙ্কিত ও লিপিবদ্ধ আছে। পরমেশ্বরের স্বরূপ (সিফত) উক্ত নিয়মাবলীর অনুরূপ হবে। শুধু কুরআন বর্ণিত পরমেশ্বরের স্বরূপই উক্ত নিয়মাবলীর অনুরূপ। খ্রিষ্টানের ঈশ্বর শুধু বাইবেলের পৃষ্ঠাতেই সীমাবদ্ধ। যাদের সমীপে বাইবেল পৌঁছে নি তারা এ ঈশ্বরের বিষয় কিছুই অবগত নয়। কিন্তু কুরআন প্রচারিত পরমেশ্বর কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই অপরিচিত নয়। অতএব কুরআনে যে পরমেশ্বর চিত্রিত, যাঁর সাক্ষ্য মানব স্বভাব ও প্রাকৃতিক নিয়মাবলী কর্তৃক প্রদত্ত তিনিই প্রকৃত পরমেশ্বর বা আল্লাহ্ তা'লা।

হাতে হলেও তাঁদের হাতে শুধু পুরাতন কাহিনী বৈ আর কিছুই অবশিষ্ট না থাকলেও তাঁর (স:) গৌরবমন্ডিত অলৌকিক কাজ বা মু'জিযা লুপ্ত হয় নি। তাঁর (স:) ওহী বা আকাশবাণী বন্ধ হয় নি। সর্বদাই কামিল বা সিদ্ধ মুসলমান মহাপুরুষদের (যারা তাঁকে পূর্ণরূপে অনুসরণ করে তাঁরই মতে জীবন-যাপন ও চরিত্র গঠন করেছিলেন) যোগে তাঁর (স:) মু'জিযা জগতে বিকশিত হচ্ছে। তাই ইসলাম ধর্মই জীবিত ধর্ম। ইসলামের ঈশ্বরই জীবিত ঈশ্বর। আর একবার জ্বলন্ত সাক্ষ্য দিতে আমি মহা সম্মানিত পরমেশ্বরের দাসরূপে অবতীর্ণ হয়েছি। আজ পর্যন্ত আমার হাতে হযরত রসূল (স:) ও তাঁর কুরআনের সত্যতা সম্বন্ধে সহস্র সহস্র নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। পরমেশ্বরের পবিত্র বাক্যালাপে আমি প্রায় প্রত্যহই সম্মানিত হচ্ছি।

অতএব সতর্কতা অবলম্বন করে চিন্তা করুন, দেখুন দুনিয়াতে হাজার হাজার ধর্ম স্বর্গীয় ধর্ম বলে কথিত হয় কিন্তু কোন্ ধর্ম পরমেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত ও মনোনীত তা কিরূপে নির্ণয় করবেন? সত্য ধর্ম অবশ্যই বিশেষ বিশেষ লক্ষণযুক্ত। যুক্তিসঙ্গত হওয়ার দাবী প্রচারই ঐশী ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়। কারণ মানুষও যুক্তি প্রদান করতে সমর্থ। শুধু মানুষের যুক্তিপ্রমাণে যে ঈশ্বরের সৃষ্টি হয় তিনি ঈশ্বর নন। যিনি প্রবল যুক্তিপ্রমাণ ও নিদর্শনসহ স্বীয় অস্তিত্ব প্রকাশ করেন তিনিই প্রকৃত পরমেশ্বর। পরমেশ্বর স্থাপিত ও পরমেশ্বর মনোনীত অবিকৃত সত্য ধর্মে বিশ্বের ঐশী চিহ্ন বিদ্যমান থাকবে এবং তা ঐশী মোহরে চিহ্নিত হবে। ধর্মের সত্যতা পরীক্ষার্থে এটা একান্তই আবশ্যক। নতুবা এ ধর্ম যে শুধু ঐশী হাত হতেই জন্ম গ্রহণ করেছে তা কিরূপে বুঝবেন? শুধু ইসলাম ধর্মই এ ধর্ম। শুধু এ ধর্মের সাহায্যেই অতি গোপনীয় ও লুক্কায়িত পরমেশ্বরের সন্ধান পাওয়া যায়। এ ধর্মের প্রকৃত অনুচরদের সমীপেই পরমেশ্বর প্রকাশিত হয়ে থাকেন। বস্তুত এটাই একমাত্র সত্য ধর্ম। সত্য ধর্মে পরমেশ্বরের বিশেষ সহায় বিদ্যমান। এতেই তিনি প্রকাশিত হয়ে বলেন, 'আমি বর্তমান আছি'। যেসব ধর্মের ভিত্তি শুধু গল্পকাহিনীর ওপর সংস্থাপিত সেগুলো মূর্তিপূজা অপেক্ষা শ্রেয় ধর্ম নয়। এসব ধর্মে সত্যতার প্রাণ নেই। ঈশ্বর যেমন পূর্বে জীবিত ছিলেন যদি এখনও তেমন জীবিত থেকে থাকেন, তিনি যদি পূর্বের ন্যায় এখনও কথা শুনতে ও বলতে পারেন, তবে এ যুগে যে তিনি মরার মত নিঃশব্দ থাকবেন এ কথার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। অতএব যে ধর্ম বর্তমান যুগেও পরমেশ্বরের শ্রবণশক্তি ও বাক্শক্তি উভয়ই সপ্রমাণ করতে সক্ষম তা-ই সত্য ধর্ম। বস্তুত সত্য ধর্মের অনুচরকে স্বয়ং পরমেশ্বর স্বীয় বাক্যালাপ ও সাদর সম্ভাষণ দ্বারা তাঁর অস্তিত্বের সংবাদ জ্ঞাপন করেন।

পরমেশ্বরের পরিচয় লাভ অতি দুরূহ কাজ। পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পরমেশ্বরের সন্ধান দিতে অক্ষম। স্বর্গ মর্ত্য দর্শনে এ অটল ও প্রকাশ্য রচনা কৌশলের কোন সৃষ্টিকর্তা হওয়া আবশ্যক, শুধু এ কথা প্রমাণিত হয়। কিন্তু তিনি যে এখন বিদ্যমান তা প্রমাণিত হয় না। 'হওয়া আবশ্যক' ও 'বিদ্যমান' এ দু'টি কথার পার্থক্য বেশ সুস্পষ্ট। অতএব দেখা যায় শুধু কুরআন শরীফই পরমেশ্বরের অস্তিত্বের সন্ধান দিতে কার্যত সমর্থ। কুরআন শুধু পরমেশ্বরকে পরিচয় করে দিতে সহায়তা করে ক্ষান্ত হয় না। কুরআন স্বয়ং পরমেশ্বরকে দেখিয়ে দেয়। আকাশের নিচে আর এমন কোন গ্রন্থ নেই যা সে গুপ্ত অস্তিত্বের সন্ধান দিতে সমর্থ।

পরমেশ্বরের অস্তিত্ব, অসীম সৌন্দর্য ও পূর্ণ গুণাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করে কুপ্রবৃত্তি ও কুমতির আকর্ষণ হতে মানবের মুক্তিলাভ ও পরমেশ্বরের সাথে ব্যক্তিগত প্রেম-ভালোবাসা স্থাপনই ধর্মের উদ্দেশ্য। এ অবস্থাই প্রকৃত জান্নাত বা স্বর্গ। এটাই পরলোকে বিভিন্ন বেশে প্রকাশিত হবে। সত্য পরমেশ্বরের কোন সংবাদ না রেখে তাঁর কাছ হতে দূরে অবস্থান, তাঁর সাথে প্রকৃত প্রেম ও ভালোবাসা স্থাপনে অনটনই নরক, এটাই পরলোকে বিভিন্ন বেশ ধারণ করে বিকশিত হবে। পরমেশ্বরের অস্তিত্বে দৃঢ়বিশ্বাস লাভ ও তাঁর সাথে পূর্ণ প্রেম ও ভালোবাসা স্থাপনই ধর্মের মূল উদ্দেশ্য।

কোন্ ধর্মে কোন্ গ্রন্থে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে তা-ই এখন বিচার করে দেখা আবশ্যক। বাইবেলে স্পষ্ট জবাব দেয়া হয়েছে– পরমেশ্বরের সাথে কথাবার্তা ও বাক্যালাপের দ্বার বন্ধ। দৃঢ়-বিশ্বাস লাভের পথ অবরুদ্ধ। যা হবার পূর্বেই হয়েছে, ভবিষ্যতে হবে না। এ যুগেও শুনতে সক্ষম তিনি। কেন এ যুগে বলতে অক্ষম হবেন এটা বড়ই আশ্চর্যের বিষয়! কেন প্রাথমিক যুগে তিনি বলতেন ও শুনতেন কিন্তু এখন শুধু শুনেন কিন্তু বলেন না, এমন বিশ্বাসে কি মানবহৃদয় শান্তি লাভ করতে সমর্থ? বৃদ্ধ হলে মানুষের যেমন কোন কোন শক্তি নিষ্কর্মই হয় সেরূপে সময়ের গতিতে যে ঈশ্বরের কোন কোন শক্তি নিষ্কর্মা হয়, তিনি কোন্ কাজের ঈশ্বর? আবার যে ঈশ্বরকে বেঁধে বেত্রাঘাত না করলে, যার মুখে থু থু না ফেললে, যাকে কিছুদিন হাজতে না রাখলে ও অবশেষে ক্রুশে না চড়ালে, নিজ দাসদের পাপ ক্ষমা করতে অক্ষম, তিনিই বা কোন কাজের ঈশ্বর? যার উপর রাজ্যহারা পদানত ইহুদী জাতি বিজয়ী ও প্রবল হয়েছিল সে ঈশ্বরের প্রতি আমরা বড়ই অসন্তুষ্ট। যে পরমেশ্বর মক্কার এক দরিদ্র ও নিঃসহ ব্যক্তিকে নবী নিযুক্ত করে তাঁর শক্তি ও বিজয়-প্রভাব সে যুগেই সুমুদয় জগতে প্রকাশিত করেছিলেন,

প্রবল-প্রতাপ পারস্য সম্রাট এ নবী (স:)-কে গ্রেফতার করতে সিপাহী প্রেরণ করলে যে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর তাকে আদেশ দিয়েছিলেন, 'হে রসূল তুমি সিপাহীদের বলে দাও, গত রাতে আমার প্রভু তোমার প্রভুর প্রাণ সংহার করেছেন'- আমরা শুধু সে পরমেশ্বকেই সত্য পরমেশ্বর বলে জানি। ভেবে দেখুন, এক ব্যক্তি ঈশ্বরত্বের দাবী করলেন কিন্তু রোমান গভর্ণমেন্টের এক সিপাহী তাকে গ্রেফতার করে ১/২ ঘন্টার জেলখানায় পুরে দিল। তার সারারাতের কাতর প্রার্থনাও মঞ্জুর হলো না। অন্য ব্যক্তি শুধু ঈশ্বর-প্রেরিত নবী বলে দাবী করলেন আর পরমেশ্বর তার বিরোধী সম্রাটদেরকেও বিনাশ করলেন? 'দিগ্বিজয়ীর বন্ধু হও তুমিও দিগ্বিজয়ী হবে'- এ প্রবাদ বাক্য সত্যান্বেষণকারীর জন্য বড়ই উপকারজনক। যা মৃতধর্ম তা গ্রহণ করে আমরা কী করব? যা মৃত গ্রন্থ তাদিয়ে আমাদের কী উপকার হবে? যিনি মৃত পরমেশ্বর তিনি আমাদের কী জ্যোতি প্রদান করবেন? যাঁর হাতে আমার প্রাণ সুরক্ষিত আমি সেই পরমেশ্বরের শপথ করে বলছি- আমি আমার পবিত্র পরমেশ্বরের নিঃসন্দেহ ও সুনিশ্চিত বাক্যালাপ দ্বারা সম্মানিত হয়েছি এবং প্রায় প্রত্যহই হচ্ছি। যিশু যে ঈশ্বরকে বলেছেন- 'তুমি আমাকে কেন পরিত্যাগ করলে'। সে ঈশ্বর আমাকে কখনো পরিত্যাগ করেন নি! মসীহ্‌র ন্যায় আমিও বহুবার আক্রান্ত হয়েছি কিন্তু প্রতি আক্রমণেই শত্রু অকৃতকার্য হয়েছে। আমাকে ফাঁসী দিতে ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল কিন্তু যিশুর ন্যায় আমি ক্রুশ বিদ্ধ হই নি। প্রত্যেক বিপদেই আমার খোদা আমাকে রক্ষা করেছেন। আমার জন্য তিনি বড় অলৌকিক ঘটনা দেখিয়েছেন। তাঁর শক্তিশালী হাত প্রসার করেছেন। হাজার হাজার নিদর্শনের মাধ্যমে সুসিদ্ধ করেছেন যে, যিনি কুরআন অবতীর্ণ করেছেন ও হযরত (স:)-কে প্রেরণ করেছেন তিনিই প্রকৃত পরমেশ্বর। আমি এ বিষয়ে ঈসা মসীহ্‌র কোনরূপ শ্রেষ্ঠত্ব দেখতে পাই নি। তাঁর সম্বন্ধে যে অলৌকিক কাজ বর্ণিত আছে তদ্রূপ বরং তদপেক্ষা অধিকতর অলৌকিক কাজ ও ঘটনা আমাতেই পূর্ণ হচ্ছে। আমি এ সম্মান শুধু এক নবীকেই অনুসরণ করে লাভ করেছি। এ নবী আমাদের নবী ও নেতা হযরত মুহাম্মদ (স:)। এ নবীর প্রকৃত সম্মান ও পদবী সম্বন্ধে সারা পৃথিবী সম্পূর্ণ অজ্ঞ। যদিও জীবনের সব চিহ্ন শুধু হযরত মুহাম্মদেরই (স:) পাওয়া যায়, তথাপি মুর্খ ও অজ্ঞ লোকেরা বলে ঈসা আকাশে জীবিত আছেন। এটা বড়ই অদ্ভুত ও অবিচার। তারা বলে, কেন তুমি প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র দাবী করলে? কিন্তু আমি সত্য সত্য বলছি, এ নবীকে পূর্ণরূপে অনুসরণ করলে, ঈসা নবী কেন তাঁর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়াও সম্ভবপর। অন্ধেরা বলে, এটা কুফরী ও অবিশ্বাস। কিন্তু তোমরা যখন নিজেরাই বিশ্বাসরত্ন হারিয়েছ তখন কুফরী বা

অবিশ্বাস কাকে বলে কিরূপে বুঝবে? তোমরা যদি **ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুস্তাক্বীম সিরাত্বাল্‌লাযীনা আন্‌আমতা আলায়হিম–** (সূরা ফাতিহা : ৬-৭) এর অর্থ অবগত থাকতে তবে এমন কুফরী ও অবিশ্বাসীর বাণী মুখে আনতে না। খোদা তাআলা তোমাদেরকে উৎসাহিত করে বলেছেন, 'তোমরা এ রসূলের পূর্ণ তাবেদারী করলে, রসূলদের বিভিন্ন কামাল ও পূর্ণগুণ একাধারে অর্জন করতে সমর্থ হবে।' আর তোমরা শুধু এক নবীর কামাল ও পূর্ণগুণ লাভ করাকে কুফরী, অবিশ্বাস ও অধর্ম বলছো?

কিরূপে খোদা তাআলার মনোনীত সত্য-ধর্ম চিনে নেয়া যায়– এর প্রতি আপনার মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। স্মরণ রাখবেন, যে ধর্মে খোদার সন্ধান পাওয়া যায় তা-ই সত্য-ধর্ম। অন্যান্য ধর্মে শুধু মানুষের চেষ্টা ও সাধনা দেখা যায়। শুধু মানুষের চেষ্টায় পরমেশ্বর আবিস্কৃত হলে তিনি মানুষের কাছে এ জন্য ঋণী হয়ে পড়েন। ইসলাম ধর্মে প্রতিযুগেই **আনাল মওজুদু** বা আমি আছি– এ বাণীর মাধ্যমে খোদা তাআলা নিজ অস্তিত্বের সন্ধান দেন। তদনুসারে এ যুগেও তিনি আমার কাছে আত্ম-প্রকাশ করেছেন। অতএব যাঁর উপলক্ষ্যে আমরা খোদা তাআলাকে চিনতে সক্ষম হয়েছি সে নবীর ওপর হাজার সালাম, শান্তি, কল্যাণ ও আশিস বর্ষিত হোক!

হযরত মরিয়মকে কুরআনে উখতা হারূন বা হারূনের বোন বলা হয়েছে। এ কথা শুনে আপনার মনে (ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে) মন্দভাব উদিত হয়েছে জেনে আমি দুঃখের সাথে পুনরায় বলছি, এতে আপনার অতি অজ্ঞতা প্রকাশিত হয়েছে। এ অনর্থক আপত্তির প্রতিবাদে পূর্ববর্তী ওলামা ও পন্ডিতেরা অনেক কথা লিখে গেছেন। রূপকস্বরূপ কিংবা অন্য কোন কারণে যদি খোদা তাআলা মরিয়মকে হারূনের বোন বলে থাকেন তবে আপনি এত আশ্চর্যান্বিত হচ্ছেন কেন? কুরআনে বারংবার বর্ণিত হয়েছে, হারূন ও মূসা সমসাময়িক নবী ছিলেন। মরিয়ম হযরত ঈসার মা, আর ঈসা নবী মূসা নবীর ১৪০০ বছর পর জন্মে ছিলেন। তবে 'নাউযুবিল্লাহ্‌' খোদা তাআলা এ ঘটনাবলী সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন এবং ভ্রমবশত মরিয়মকে হারূনের বোন বলে ফেলেছেন– এটাই কি প্রমাণিত হয়? যারা অনর্থক আপত্তি উত্থাপন করে আমোদ পায় তারা কত দুশ্চরিত্র ও দুষ্ট প্রকৃতির! মরিয়মের হারূন নামে কোন ভাই থাকাও অসম্ভব নয়, কোন বস্তু বিশেষের অজ্ঞতা সেই বস্তুর অস্তিত্বহীনতার প্রমাণ নয়। বাইবেল যে কত যুক্তিসঙ্গত আপত্তির লক্ষ্য হতে পারে, খ্রিষ্টানরা নিজেদের থলিতে হাত দিয়ে সে কথা ভেবে দেখেন না।

মরিয়ম চিরকাল বায়তুল মোকাদ্দসের খাদেমা বা সেবিকারূপে জীবন যাপন করবেন; তিনি আজীবন স্বামী গ্রহণে বিরত থাকবেন, এ বলে তাকে মসজিদে উৎসর্গ করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁরই ৬/৭ মাসের গর্ভ প্রকাশ হয়ে পড়লে অন্তঃস্বত্ত্বা অবস্থায়ই সমাজের নেতা ও প্রাচীন ব্যক্তিরা ইউসুফ (যোসেফ) নামক এক সুত্রধরের কাছে তাকে বিয়ে দিলেন। স্বামীগৃহে যাওয়ার ২/১ মাস পরেই এক পুত্র জন্মিল। সে পুত্রই ঈসা বা যিশু নামে অভিহিত। দেখুন, এগুলো কত বড় আপত্তির কথা। প্রথম আপত্তি এই, মরিয়মের গর্ভ বাস্তবিকই যদি অলৌকিক ঘটনা হতো তবে প্রসবকাল পর্যন্ত কেন অপেক্ষা করা হলো না? দ্বিতীয় আপত্তি– এ মন্দিরের আজীবন পরিচর্যার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে কেন তাকে সূত্রধর ইউসুফের পত্নী করা হলো? তৃতীয় আপত্তি– তওরাত গ্রন্থ মতে গর্ভবতী স্ত্রীলোকের বিয়ে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও হারাম হওয়া সত্ত্বেও, ইউসুফের অনিচ্ছা সত্ত্বেও, তার প্রথমা স্ত্রী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও স্বর্গীয় ধর্মশাস্ত্রের আদেশ অমান্য করে গর্ভবতী অবস্থায় তাঁর বিয়ে সম্পাদিত হলো? যারা বহু বিবাহের বিরোধী তারা হয়ত ইউসুফের বিয়ের কোন সংবাদ জানেন না। অসদুপায়ে মরিয়মের গর্ভ সঞ্চার হয়ে থাকবে, এ সন্দেহে পড়েই সমাজের নেতৃবৃন্দ তাঁকে উক্ত অবস্থায় বিয়ে দিয়েছিলেন। যে কোন আপত্তিকারক ন্যায়সঙ্গতভাবে এ ধারণা পোষণ করতে সমর্থ হয়। ইহুদী জাতিকে পুনরুত্থান প্রদানার্থে শুধু পরমেশ্বরের মহিমা বলেই যে মরিয়ম গর্ভবতী হয়েছিলেন, কুরআন শরীফের শিক্ষামতে তা আমরা অবশ্যই বিশ্বাস করি। বর্ষাকালে হাজার হাজার কীট পতঙ্গ নিজে নিজে জন্মগ্রহণ করে। হযরত আদম (আ:)ও মা-বাবা ছাড়া জন্মেছিলেন। অতএব হযরত ঈসার এ জন্মে কোনই মাহাত্ম্য নেই। স্বয়ং পিতৃহীন জন্ম কোন কোন বিষয়ে কিছু কিছু শক্তি-শূন্যতার প্রকাশক। যে অবলাকে বায়তুল মুকাদ্দসের সেবার জন্য নজর দেয়া হয়েছিল তার বিয়ের কী আবশ্যকতা? অতএব হযরত মরিয়মের বিয়ে শুধু সন্দেহেরই ফল। দুঃখের বিষয়, এ বিয়ে বহু অনিষ্টের কারণ হয়েছে। অকর্মণ্য হতভাগা ইহুদীরা এখেকে অবৈধ সহবাসের প্রচার করেছে। অতএব যদি কোন ন্যায়সঙ্গত আপত্তি থাকে তবে এ সবই আপত্তি, হারূনকে মরিয়মের ভাই বলায় কোন আপত্তি উত্থাপন করা যায় না। মরিয়ম 'হারূন নবীর ভগ্নী' কুরআনে এমন কথাও নেই। শুধু 'হারূন' শব্দ আছে 'নবী' শব্দ নেই। ইহুদী সমাজে নবীদের নামে নাম করণের প্রথা ছিল। অতএব হারূন নামে মরিয়মের কোন ভাই থাকাও সম্ভব। এ কথার আপত্তি উত্থাপন করা বোকার লক্ষণ ও স্পষ্ট বোকামী।

ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের পুরাতন পুস্তকে যদি 'আসহাবে কাহ্‌ফ' প্রভৃতি গল্প দেখতে পাওয়া যায়, তারা যদি সেগুলোকে কৃত্রিম ও কাল্পনিক গল্প বলে ধারণা করে তবে তাতেই বা ক্ষতি কি? মনে করবেন এদের ধর্ম পুস্তক, ঐতিহাসিক পুস্তক ও স্বর্গীয় পুস্তকগুলো সম্পুর্ণ আঁধারে আবৃত। আজকাল ইউরোপ এ গ্রন্থাবলী নিয়ে কত শোকাকুল। সরল স্বভাব বিশিষ্ট নর-নারীরা কিরূপে স্বতঃই ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে, কত বড় বড় গ্রন্থ ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতায় লিখতে হচ্ছে, আপনি হয়ত তা অবগত নন। আমেরিকা প্রভৃতি দেশের কয়েকজন খ্রিষ্টান তজ্জন্যই আমাদের জামাতে প্রবেশ করেছেন। অসত্য কতদিন আবৃত অবস্থায় থাকতে পারে? ভেবে দেখুন খোদার ওহীতে এরূপ পুস্তক হতে বর্ণনা উদ্ধৃত করার কী আবশ্যকতা? স্মরণ রাখবেন, এরা চক্ষুহীন, এদের যাবতীয় পুস্তক জ্যোতিহীন ও আঁধারময়। কুরআন আরব উপদ্বীপে অবতীর্ণ হয়েছিল। আরবের অধিবাসীরা সাধারণত খ্রিষ্টান ও ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থের কোন সংবাদই রাখত না। হযরত (স:) নিজেও উম্মী বা নিরক্ষর ছিলেন। এসব কথা জেনে শুনেও যারা সেসব অপবাদ মহাপুরুষের প্রতি আরোপিত করে তাদের অন্তরে অণুমাত্রও খোদাভীতি নেই। হযরত (স:)-এর বিরুদ্ধে এ আপত্তি উত্থাপন করা যুক্তিসঙ্গত হলে, হযরত ঈসা (আ:)-এর বিরুদ্ধে কতই না আপত্তি উত্থাপিত হবে? যীশু এক বনী ইস্রাইলী মাওলানা সাহেবের কাছে তওরাত কিতাব এক এক করে পাঠ করে পড়ে নিয়েছিলেন, 'তালমূদ' ও ইহুদীদের যাবতীয় ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেছিলেন। তাঁর ইঞ্জীল বস্তুত বাইবেল ও তালমূদের বাক্যে এত পরিপূর্ণ যে ইঞ্জীলের সত্যতা সম্বন্ধে দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হয়! আমরা শুধু কুরআন শরীফের আদেশ পালনেই এতে বিশ্বাস করি। দুঃখের বিষয় পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে মজুদ নেই এমন একটি কথাও ইঞ্জীলে নেই। কুরআন যদি বাইবেলের ভিন্ন ভিন্ন সত্য কথা, সত্য নীতি ও ধর্ম সম্বন্ধীয় অন্যান্য যাবতীয় সত্য একত্র করে থাকে তবে এতেই বা কি নির্বোধের কাজ করা হয়েছে এবং কি অনিষ্টের সূচনা করা হয়েছে? কুরআন শরীফের কাহিনী ও গল্প শুধু ওহী বা দৈববাণী হতেই প্রাপ্ত। তা কি আপনার মতে অসম্ভব? হযরত (স:)-এর সমীপে ওহী বা আকাশবাণীর অবতরণ অকাট্য প্রমাণ দ্বারা সুসিদ্ধ ও প্রমাণিত। তাঁর সত্য নবুওয়ত ও প্রেরিত হওয়ার আলোক, আশীর্বাদ ও বরকত আজ পর্যন্তও বিকশিত হচ্ছে। তবে নাউযুবিল্লাহ্‌, কুরআনের কোন কোন গল্প পূর্ববর্তী গ্রন্থ বা শিলালিপি হতে নকল করা হয়েছে, এ শয়তানী ধারণা কি হৃদয়ে কখনো স্থাপন করা সম্ভবপর হয়? খোদা তাআলার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কি আপনার কোন সন্দেহ জন্মেছে? আপনি কি তাঁকে অন্তর্যামী ও সর্বজ্ঞ

বলে অবগত নন? ইহুদী ও খৃষ্টানরা কোন কোন গ্রন্থকে মৌলিক ও কোন কোন গ্রন্থকে কৃত্রিম বলে নির্দেশ করেন। কিন্তু এটা তাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব অভিমত। আমি ইতোপূর্বেই বলেছি, তারা কোন মৌলিক গ্রন্থের মৌলিকতা দেখতে পায় নি কোন কৃত্রিম পুস্তকের কৃত্রিম লেখককে ধরে দিতে পারে নি। এ বিষয়ে ইউরোপীয় বহু সমালোচক মহা পন্ডিতের সাক্ষ্য আমার কাছে মজুদ আছে। তারা অতি অন্ধ। তাদের বিশ্বাস-জ্যোতি সম্পূর্ণ নির্বাপিত। যে খ্রিষ্টানরা পদার্থ বিদ্যা ও দর্শন শাস্ত্রের অনুশীলনে তিমির সাগরে নিমজ্জিত ও আকাশের অস্তিত্ব অস্বীকারকারী তারাই আবার যিশুখ্রিষ্ট জড়দেহে আকাশে উপবিষ্ট, এ বিশ্বাস পরিপোষণকারী। হায়! এদের জন্য কত পরিতাপ। বস্তুত ইহুদীদের আদিম ধর্ম পুস্তকগুলো সত্য হলে এদের ওপর নির্ভর করে হযরত ঈসা (আ:)কে নবী বলা যায় না। দেখুন তিনি যে মসীহ্ মাওউদের দাবী করেছিলেন, মালাকী নবীর গ্রন্থানুসারে তাঁর আগমনের পূর্বেই ইলিয়াস নবীর আসমান হতে অবতরণের একান্তই আবশ্যক ছিল। কিন্তু কোথায় সেই ইলিয়াস? তিনি এখনও অবতীর্ণ হন নি। ফলত এটা ইহুদীদের অতি প্রবল যুক্তি। হযরত ঈসা এর খুব স্পষ্ট উত্তর দিতে পারে নি। হযরত ঈসাকে নবী বলে কুরআন শরীফ তাঁর মহোপকার সাধন করেছে। হযরত ঈসা নিজেই খ্রিষ্টানদের প্রায়শ্চিত্ববাদের খন্ডন করেছেন। তিনি বলেছেন, 'ইউনুস নবী তিন দিন মাছের পেটে সজীব রয়েছিলেন, আমি তাঁরই সদৃশ'। ঈসা নবী যদি বাস্তবিকই ক্রুশে মরে থাকেন তবে ইউনুস নবীর সাথে তাঁর সাদৃশ্য কোথায়? তাঁর সাথে তাঁর সম্বন্ধই বা কী? হযরত ঈসা যে ক্রুশে মরেন নি, শুধু সংজ্ঞাহীন মৃতবৎ ছিলেন, তা-ই এ উপমায় প্রতিপন্ন হয়। 'মরহমে ঈসা' নামক যে বিখ্যাত ঔষধের ব্যবস্থা প্রায় সব হাকিমী চিকিৎসা গ্রন্থেই পাওয়া যায় এর শিরোনামে লিখিত আছে যে হযরত ঈসার জন্যই অর্থাৎ তাঁর ক্ষত আরোগ্য করার জন্য প্রথম এ ব্যবস্থাপত্র প্রস্তুত করা হয়েছিল।

ঘরের ভিতরে যদি করে কেউ বাস
এতেই হবে যা করলাম ফাস।

পরিশিষ্ট

এ পুস্তিকার শেষভাগে প্রকৃত মুক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিপিবদ্ধ করা আমার মতে আবশ্যক। ধর্মবাদীগণ মুক্তির জন্যেই নিজ নিজ ধর্মমত মেনে চলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ মানুষই মুক্তির মূল মর্ম অবগত নন। অনেকে আবার এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন। খ্রিষ্টানরা বলেন, পাপের প্রতিফল হতে রক্ষা পেলেই মুক্তি হয়। কিন্তু আমার মতে পাপের প্রতিফল হতে মুক্তি লাভ হলেই স্বর্গলাভ হয় না। ব্যভিচার, চুরি, নরহত্যা, মিথ্যা সাক্ষ্য ও নিজ নিজ জ্ঞানবিশ্বাস মতে অন্যান্য মন্দ কাজে রত না হলে যে মানুষ মুক্তি পেল, এ কথা সত্য নয়। যে অসীম অনন্ত আনন্দময় অবস্থা অর্জনের প্রবল পিপাসা ও তীব্র ক্ষুধা মানবস্বভাবে চির নিহিত, যা শুধু খোদার ব্যক্তিগত ভালোবাসা, পূর্ণজ্ঞান ও তাঁর সাথে পূর্ণ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনের বলেই পাওয়া যায়, মানব হৃদয় ও খোদার আত্মা উভয়ই প্রেমে বিগলিত না হলে যা লাভ করা অসম্ভব, এরই নাম মুক্তি। কিন্তু যা পরিণামে তার অসীম দুঃখকষ্টের কারণ হবে, অনেক সময় ভ্রমবশত মানুষ একেই আনন্দময় অবস্থা অর্জনের একমাত্র উপায় মনে করে এবং পৃথিবীতে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিই অনন্ত সুখের কারণ বলে কল্পনা করে। আর দিন-রাত মদিরা পানে ও ইন্দ্রিয় সেবনে রত থাকে। এ দোষে পরিশেষে নানা প্রকার প্রাণনাশক রোগে আক্রান্ত হয়। তারা পক্ষাঘাত, অপস্মার, অন্ত্র বা যকৃতের ফোড়ায় আক্রান্ত হয়ে কিংবা গরমী ও প্রমেহের লজ্জাজনক রোগে ভুগে এ পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় নেয়। তাদের শক্তিগুলো অসময়ে ক্ষয় পায় বলে তারা স্বাভাবিক দীর্ঘায়ু লাভ করতে সক্ষম হয় না। অবশেষে তারাও অসময়ে একথা বুঝে নিতে সমর্থ হয় যাকে তারা অনন্ত আনন্দের উপকরণ বলে মনে করত তা-ই তাদের ধ্বংসের মূলীভূত কারণ ছিল। কেউ কেউ দুনিয়ার মান-সম্মান ক্ষমতা সুনাম ও উচ্চপদকেই আসল আনন্দের কারণ মনে করে মানব জীবনের মূল উদ্দেশ্য ভুলে যায়। অবশেষে অনুতাপ করতে করতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কেউ কেউ ধনোপার্জনকে প্রকৃত সুখের কারণ মনে করে দিনরাত এতেই রত থাকে। কিন্তু অবশেষে সংগৃহীত ধনরত্ন পরিত্যাগ করে অতি দুঃখে, অত্যন্ত কষ্টে ও ঐকান্তিক অনিচ্ছায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। অতএব কিভাবে সেই অনন্ত আনন্দময় অবস্থা অর্জন করা সম্ভবপর হবে সত্যান্বেষণকারীকে তা ভেবে দেখা একান্ত আবশ্যক। ফলত এ অনন্ত ও চিরস্থায়ী আনন্দের অবস্থায় পৌছে দেয়াই সত্য ধর্মের লক্ষণ। যে প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞান পরমাত্মীয় পরমেশ্বরের যে পবিত্রপূর্ণ ব্যক্তিগত প্রেম ও পূর্ণ বিশ্বাস মানব-হৃদয়ে প্রোমোচ্ছ্বাস সৃজন করতে সক্ষম হয় তা-ই যে উক্ত নিত্য

আনন্দময় অবস্থা, আমরা শুধু কুরআনের সহায়তায় উক্ত নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি। এ ক'টি কথা, বলতে অতি অল্প বটে, কিন্তু এর সারমর্ম বর্ণনা করতে এক পুস্তকেও কুলোবে না।

খোদার মা'রেফতের (প্রকৃত ঈশ্বর জ্ঞানের) ক'টি বিশেষ লক্ষণ আছে। এক লক্ষণ এরূপ– এতে তাঁরই শক্তি, একত্ব জ্ঞান, সৌন্দর্য ও গুণে কোনরূপ অপূর্ণতার কালিমা বা কলঙ্ক থাকা সম্ভবপর বলে কোনরূপ সন্দেহ জন্মাবে না। নিখিল বিশ্বের সব পরমাণু যার আদেশে পরিচালিত, জগতের যাবতীয় আত্মা, স্বর্গমর্ত্যের যাবতীয় দেহ যাঁর অধীন, কারও যদি শক্তি জ্ঞান ও ক্ষমতা অপূর্ণ হয়, তবে তার পক্ষে এ আধ্যাত্মিক ও শারীরিক জগতগুলোর শাসন কাজ পরিচালনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হবে। (খোদার আশ্রয় প্রার্থনা করি) কেউ যদি পরমাণুগুলো ও তাদের সব শক্তি, আত্মাগণ ও তাদের সব শক্তি স্বতঃপ্রসূত বা স্বয়ম্ভু বলে বিশ্বাস করে তবে তাতে খোদার জ্ঞান, একত্ব ও শক্তি তিনটিই অপূর্ণ বলে স্বীকার করতে হবে। আত্মা ও পরমাণু যদি খোদার সৃষ্ট বস্তুই না হয়, তবে তিনি যে এগুলোর অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পূর্ণরূপে অবগত থাকবেন একথা দৃঢ়বিশ্বাস করার কোনই কারণ দেখা যায় না। তাঁর এমন জ্ঞানের কোন প্রকার প্রমাণ পাওয়া দূরের কথা, এ বিষয়ে তাঁর অজ্ঞতারই বেশি পরিচয় পাওয়া যায়। অতএব আমাদের মতে তিনিও এগুলোর মূলতত্ত্ব অবগত নন, তাঁর জ্ঞানও এগুলোর গুপ্ত ও দুর্ভেদ্য রহস্য উদঘাটন করতে সমর্থ হয় নি, একথা বাধ্য হয়ে স্বীকার করতে হবে। কোন ব্যক্তি আপন হাতে ঔষধ তৈরী করলে, তার চোখের সামনে তার হুকুম মতে কোন সিরাপ, শরবত, বড়ি বা আরক তৈরী হলে, যে স্বয়ং ব্যবস্থাদাতা সে বলে এটা অমুক ঔষধ– অমুক অমুক ওজনে ও পরিমাণে প্রস্তুত, একথা বেশ বলতে পারবে। কিন্তু কোন আরক, বড়ি বা শরবত যদি এমন অজানাভাবে তৈরী করা হয় যে তিনি এগুলো প্রস্তুতও করেননি, একে অংশে বিভাগ করতেও সক্ষম হন নি, তবে তিনি নিশ্চয় এসব ঔষধ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকবেন। খোদাকে পরমাণু ও আত্মাসমূহের সৃজনকারী স্বীকার করলে, তিনি এগুলোর নিগূঢ় শক্তি ও ক্ষমতা সম্পূর্ণ অবগত, একথাও স্বতঃসিদ্ধ হয়। কেননা তিনিই স্বয়ং উক্ত ক্ষমতা ও শক্তিসমূহ সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টবস্তু সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকতে পারেন না। কিন্তু তাঁকে যদি এগুলোর সৃষ্টিকর্তা বলে অস্বীকার করা হয়, তবে এগুলো সম্বন্ধে তাঁর পূর্ণজ্ঞান থাকবে, একথার কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিনা প্রমাণে যদি কেউ বলে তার এ সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান আছে তবে সেটা শুধু তারই নিজের একগুঁয়ে মত ও প্রমাণবিহীন দাবীমাত্র। সৃষ্টিকর্তার অবশ্যই সৃষ্টবস্তুর জ্ঞান থাকবে। কিন্তু খোদা যা নিজ হাতে সৃষ্টি করেন নি তিনি এগুলোরও পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী, কেউ কি এমন মতের কোন

প্রমাণ প্রদান করতে সক্ষম হবেন? এর গুণ ও শক্তিসমূহ খোদা হতে অভিন্ন হলে, যেমন তিনি নিজ অস্তিত্বের বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত আছেন তেমন এদের অস্তিত্বের বিষয়েও সম্পূর্ণ জ্ঞাত থাকতেন। কিন্তু আর্য সমাজের বিশ্বাস মতে এরা পরমেশ্বর হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এরা নিজেরাই অস্তিত্বের ঈশ্বর ও প্রত্যেকেই অনাদি, অনন্ত, অসৃষ্ট, নিত্য। সুতরাং পরমেশ্বরের সাথে এরা এতই সংস্রবশূন্য যে উক্ত পরমেশ্বরের মৃত্যু হলেও এদের কিছুই ক্ষতি নেই। পরমেশ্বর উক্ত শক্তি ও ক্ষমতাসমূহ সৃষ্টি করেন নি বলে যেমন সৃষ্টির সময় তাঁর কোন আবশ্যকতা ছিল না তেমন রক্ষার সময়ও তাঁর কোন আবশ্যকতা হবে না। কুরআনে খোদার নাম 'হাইয়্যুন ক্বাইয়ুমুন'। 'হাইয়্যুন' অর্থাৎ স্বয়ং নিজ গুণে সজীব ও অন্যান্য যাবতীয় পদার্থের জীবনদাতা। 'ক্বাইয়্যুমুন' শব্দের অর্থ স্বয়ং নিজগুণে চিরস্থায়ী ও যাদের জীবনদান করেছেন তাদের স্থায়িত্বদাতা। যারা খোদার এ জীবনদাতা নামের জ্যোতি লাভ করে শুধু তারাই তাঁর স্থায়িত্বদাতা নামে জ্যোতি লাভের উপযোগী। খোদা শুধু তাঁর সৃষ্ট-বস্তুকেই স্থায়িত্ব প্রদান করতে সক্ষম। তিনি যা সৃষ্টি করেন নি তা চিরস্থায়ী করতে পারেন না। যিনি খোদাকে 'হাইয়্যুন' অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা বলে স্বীকার করেন, তিনি তাকে 'ক্বাইয়্যুমুন' অর্থাৎ রক্ষাকর্তা বলে দাবী করতে পারেন, কিন্তু যিনি তাকে সৃষ্টিকর্তা স্বীকার করেন না তিনি তাঁকে রক্ষাকর্তা বলেও দাবী করতে পারেন না। খোদা কোন বস্তুর রক্ষাকর্তা। এর অর্থ এই, তিনি রক্ষা না করলে সে বস্তু অস্তিত্ববিহীন ও শূন্য হবে। কিন্তু যিনি অস্তিত্ব সৃষ্টির জন্য খোদার মুখাপেক্ষী ছিলেন না, তিনি অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কেন তাঁর মুখাপেক্ষী হবেন? অস্তিত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে যদি পরের সহায়তার প্রয়োজন হয়, তবে অস্তিত্ব সৃষ্টির জন্যও পরের সহায়তার প্রয়োজন ছিল। ফলত খোদার 'হাইয়্যুন' ও 'কাইয়্যুমুন' নাম দুটি জ্যোতি বিকিরণে ও গুণ সম্প্রসারণে পরস্পর অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। কখনো বিচ্ছিন্নভাবে জ্যোতি বিতরণে সক্ষম নয়। যারা বস্তুত পরমেশ্বরকে পরমাণু ও আত্মাসমূহের সৃষ্টিকর্তা বলে অবিশ্বাস করে তারা যদি জ্ঞান ও বুদ্ধির অপব্যবহার না করে, তবে তিনি তাদের রক্ষাকর্তা, এ কথাও অস্বীকার করতে বাধ্য হবে। অতএব পরমাণু ও আত্মা পরমেশ্বরের সাহায্যে রক্ষিত হচ্ছে তারা এমন দাবী করতে পারবে না। কারণ ন্যায়ত পরমেশ্বরের সৃষ্ট বস্তুই তার সহায়তা প্রার্থী হয়, যার সৃষ্টির জন্য পরমেশ্বরের সহায়তার আবশ্যকতা ছিল না তার রক্ষার জন্য কেন তাঁর সহায়তার আবশ্যকতা হবে– এমন অসঙ্গত দাবীর কোনই প্রমাণ বিদ্যমান নেই।

আমরা এখন উল্লেখ করেছি, পরমাণু ও আত্মাকে অনন্ত, অনাদি স্বয়ম্ভু স্বীকার করলে পরমেশ্বর এদের যাবতীয় গোপনীয় সূক্ষ্মতম শক্তি ও ক্ষমতাসমূহ অজ্ঞাত-এমন মতের কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব তিনি তাদের পরমেশ্বর

বলে কথিত হলেই তাদের গুপ্তগুণ ও শক্তিগুলো অবশ্যই অবগত হবেন, এমন কথারও কোনই প্রমাণ বিদ্যমান নেই। দাসত্ব ও ঈশ্বরত্বের কোন সম্বন্ধও তাদের জন্য প্রমাণিত হয় না। বরং তিনি যে তাদের পরমেশ্বরই নন এটাই প্রমাণিত হয়। যার সাথে তার সৃষ্টির সম্বন্ধ নেই, তিনি কিরূপে তাদের খোদা হবেন? তাকে কোন অর্থে আত্মা ও পরমাণুর পরমেশ্বর বলবে? 'পরমাণু'র পরমেশ্বর এ সম্বন্ধ কোন্ ভিত্তির ওপর স্থাপন করা হবে? সম্বন্ধ স্বামিত্বমূলক অথবা আত্মীয়তামূলক। প্রথম প্রকারের উদাহরণ যেমন বকরের কৃতদাস। স্বামীত্বের কোন না কোন কারণ থাকা আবশ্যক। কিন্তু যে স্বাধীন ব্যক্তিরা অনন্তকাল হতে নিজ নিজ শক্তিবলে বিরাজমান, কেন অকারণে তারা পরমেশ্বরের অধীনতাপাশে আবদ্ধ হবে? আত্মীয়তামূলক সম্বন্ধের উদাহরণ যেমন যায়েদের পুত্র। কিন্তু আত্মা ও পরমাণুর সাথে পরমেশ্বরের এমন কোন আত্মীয়তার সম্বন্ধও নেই। আত্মা ও পরমাণুর সাথে পরমেশ্বরের কোন দাসত্ব ও স্বামীত্বের সম্বন্ধও নেই। অতএব এমন সম্বন্ধহীন আত্মার জন্য পরমেশ্বরের অস্তিত্বও উপকারী নয়, মৃত্যুও অপকারী নয়।

আর্য্য সমাজের উক্ত বিশ্বাস পোষণ করলে, মানুষের পক্ষে মুক্তি লাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব বলে স্বীকার করতে হবে। কারণ খোদা তাআলা সৃষ্টিকালে আত্মার স্বভাবে যে নিজ ব্যক্তিগত প্রেম নিহিত করেন মুক্তি সম্পূর্ণরূপে এরই ওপর নির্ভর করে। আত্মা খোদার সৃষ্ট পদার্থ না হলে কেন তাঁর জন্য এর স্বভাবিক প্রেম হবে? খোদা উক্ত প্রেম কবে, কোন্ অবস্থায়, কিভাবে এর স্বভাবে স্থাপন করেছেন? তাঁর পক্ষে অসৃষ্ট আত্মায় এমন ব্যক্তিগত প্রেম সৃষ্টি করা সম্পূর্ণ অসম্ভব কাজ। কারণ যে প্রেম সৃষ্টির সময় হতেই স্বভাবে নিহিত হয়, পরযুগে প্রবেশ করে না শুধু একেই স্বাভাবিক প্রেম বলে। এরই দিকে লক্ষ্য করে খোদা তাআলা কুরআন শরীফে বলেছেন, **আলাস্তু বি রব্বিকুম? ক্বালূ বালা–** (সূরা আ'রাফ : ১৭৩) আমি আত্মাদের জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আমি কি তোমাদের সৃষ্টিকর্তা নই?' তারা উত্তর দিয়েছে, 'নিশ্চয়'। এ আয়াতের সারমর্ম এই, মানবাত্মার স্বভাবে এ সাক্ষ্য বিদ্যমান আছে যে খোদা তাআলাই তার সৃষ্টিকর্তা, এ জন্যই নিজ সৃষ্টিকর্তার প্রতি আত্মার স্বাভাবিক প্রেম দেখতে পাওয়া যায়। কুরআনের অন্য এক আয়াতে এ কথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে **ফিৎরাতাল্লাহিল্লাতী ফাতারান্নাসা আলায়হা–** (সূরা রূম : ৩১) আত্মা যে এক-অদ্বিতীয় খোদার মিলন ছাড়া অন্য কিছুতেই প্রকৃত শান্তি ও আনন্দ পায় না, এটা এরই স্বাভাবিক গুণ। খোদাই মানবাত্মায় এমন আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করেছেন যে তাঁর মিলন ছাড়া সে কিছুতেই আনন্দ বা শান্তি লাভে সক্ষম হয় না। অতএব মানবাত্মায় উক্ত অভিলাষ যদি বিদ্যমান থাকে তবে স্বীকার করতে হবে, আত্মা

বস্তুতই খোদার সৃষ্ট বস্তু। তিনিই এর অন্তরে এ বাসনা ঢেলে দিয়েছেন। উক্ত বাসনা যে মানবাত্মায় বিদ্যমান তা অস্বীকার করা যায় না। অতএব এটা প্রমাণিত হলো– মানবাত্মা সত্য সত্যই পরমেশ্বরের সৃষ্ট বস্তু। দু ব্যক্তির মাঝে যত অধিক ব্যক্তিগত সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে, ততোধিক প্রেমের সঞ্চার হয়। সন্তানের জন্যে মাতার প্রেম ও মাতার জন্যে সন্তানের প্রেম এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মায়ের রক্তে সন্তানের সৃষ্টি, মাতৃ-জঠরে সন্তানের ক্রমবৃদ্ধি ও জীবনপ্রাপ্তি এ প্রেমের কারণ। অতএব আত্মার সাথে পরমেশ্বরের কোন সৃষ্টির যদি সম্বন্ধ না থাকে, তারা অনন্তকাল হতেই যদি নিজ নিজ গুণে নিজ নিজ ক্ষমতায় জীবন ধারণ করে, তবে তাদের স্বভাবে খোদার ব্যক্তিগত প্রেম বিদ্যমান থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এমন স্বাভাবিক প্রেমের অভাবে মুক্তিলাভও সম্পূর্ণ অসম্ভব।

ব্যক্তিগত প্রেমই মুক্তির মূল। এতেই খোদার সাথে মিলন হয়। প্রেমিক প্রিয়তম হতে চিরকাল বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। পরমেশ্বর স্বয়ং জ্যোতিস্বরূপ। সুতরাং তাঁর প্রেমেই মোক্ষ জ্যোতি সৃষ্টি হয়। মানব-স্বভাবে নিহিত প্রেম ঐশী প্রেমকে প্রথমত আকর্ষণ করে। ব্যক্তিগত ঐশী প্রেম এরূপে আকর্ষিত মানবীয় ব্যক্তিগত প্রেমকে এক অলৌকিক উৎসাহ ও উচ্ছ্বাস প্রদান করে। উভয় প্রেমের সম্মিলনে ফানা (নির্বাণ লাভ) হয়। এরপর এ ফানা হতে বাকা (স্থায়িত্ব) বা অনন্ত জীবনের জ্যোতি সৃষ্টি হয়। উভয়বিধ প্রেমের মিলনের অবশ্য ফল 'ফানা' বা বিলীন। যে অস্তিত্ব মাটির স্তরের মত খোদা ও আত্ম-মিলনের মাঝখানে আবরণরূপে দাঁড়িয়ে থাকতো, এতেই তা ধূলিকণার ন্যায় ফানা হয়ে উড়ে যায় এবং আত্মা খোদার প্রেমে পূর্ণরূপে মগ্ন হয়। যেমন বজ্রপাতকালে আকাশস্থিত বিদ্যুতের আকর্ষণে শরীরের সব বিদ্যুৎ বের হওয়ায় মানব দেহের বিনাশ হয় তেমনই ঐশী প্রেমের প্রবল আকর্ষণে আত্মার সব প্রেম পূর্ণ বিকশিত হওয়াতে মানবাত্মারও বিনাশ হয়। উক্ত উভয়বিধ প্রেমাগ্নি মিলনপ্রসূত মৃত্যু ছাড়া ঈশ্বরান্বেষণে পরিভ্রমণ কাজ (সূলুক) পরিসমাপ্তি হয় না। এ ফানাতেই ঈশ্বরান্বেষণে পরিভ্রমণকারীর (সালেকের) ভ্রমণ শেষ হয়। এটাই মানবীয় চেষ্টার শেষ সীমা। মানুষ আপন যত্ন ও পরিশ্রমে শুধু এ মরণ পর্যন্তই অগ্রসর হতে পারে। এ ফানাই পরিশ্রমের পরিণতি ও শেষ ফল। এরপর খোদা তাআলা শুধু তাঁর নিজ দান ও কৃপা গুণবশত মানুষকে 'বাকা' বা অনন্ত জীবন প্রদান করেন। এ 'বাকা' শুধু তাঁরই আপন দান। কোন মানুষেরই কর্মফল নয়। এরই উল্লেখ করে কুরআনে বলা হয়েছে, **সিরাত্বাল্লাযীনা আনআমতা আলায়হিম–** (সূরা ফাতিহা : ৭) এ আয়াতের সারমর্ম এই, যে ব্যক্তি এ উচ্চপদ লাভ করেছে সে শুধু দানস্বরূপই লাভ করেছে। এটা কোন পুণ্য কর্মের ফল ও পুরস্কার নয়, এটাই ঈশ্বর-প্রেমের শেষ পরিণাম। সমস্ত জীবন এতেই লাভ হয়। মরণের হাত

হতে এতেই মুক্তি লাভ হয়। খোদা তাআলা ছাড়া কারও অনন্ত জীবনের অধিকার নেই। শুধু তিনিই নিজ ক্ষমতায় চিরঞ্জীবী। তবে যিনি পরপ্রেম মুক্ত হয়ে নিজ ব্যক্তিগত প্রেম বলে 'ফানা' অর্জন করেন, তিনি খোদার অনন্ত জীবনের অংশ ছায়াস্বরূপ প্রাপ্ত হন। এমন মানবকে মুক্ত বলা সঙ্গত নয়। কেননা, সে পরমেশ্বরে বিলীন হয়েছে ও তাঁর মিলন লাভে সজীব হয়েছে। যারা খোদার সান্নিধ্য অর্জনে অসমর্থ হয়েছে, খোদা হতে সুদূরে অবস্থান করে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, তারাই মৃত ও জীবনহীন।[১২]

অতএব ব্যক্তিগত ঐশী প্রেম ও ঈশ্বর মিলনলাভ করার পূর্বেই আত্মা অনাদি চিরস্থায়ী নিত্য জীবনের অধিকারী বলে যারা বিশ্বাস করে তারা কাফির, বেদীন ও মুশরিক (অবিশ্বাসী, বিধর্মী, বহু ঈশ্বরবাদী)। বস্তুত খোদা তা'লা ছাড়া অন্য কোন বস্তুরই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অস্তিত্ব নেই। শুধু একমাত্র তিনিই প্রকৃত সত্য অস্তিত্বের অধিকারী। তবে তাঁরই ছায়ায় বাস করে তাঁরই প্রেমে মোহিত থেকে মিলনকারীদের আত্মা প্রকৃত জীবন প্রাপ্ত হয়। তাঁর মিলন ছাড়া এমন জীবন লাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব।। এজন্যেই খোদা তাআলা কুরআন শরীফে কাফিরদের 'মৃত' আখ্যা প্রদান করেছেন ও দোযখীদের (নারকীদের) সম্বন্ধে বলেছেন, **ইন্নাহূ মাইয়্যাতি রব্বাহূ মুজরিমান ফাইন্নালাহূ জাহান্নামা লায়্যামূতু ফীহা ওয়ালা ইয়াহ্‌ইয়া–** (সূরা ত্বাহা : ৭৫) অর্থাৎ যে ব্যক্তি অপরাধী অবস্থায় তার স্রষ্টা, রক্ষক ও প্রতিপালক প্রভুর সমীপে গমন করবে, তারই জন্য জাহান্নাম। সে তথায় মরবেও না বাঁচবেও না। সে খোদার ইবাদতের জন্য (পূর্ণ ঐশী গুণাবলীর জ্যোতিসমূহ নিজ স্বভাবে প্রতিফলিত করার জন্য) সৃষ্ট হয়েছে, তার অস্তিত্বের আবশ্যকতা আছে। অতএব সে মরতে পারে না। তাকে জীবিতও বলা যায় না। কেননা, ঈশ্বর মিলনই প্রকৃত জীবন, প্রকৃত জীবনই প্রকৃত মুক্তি। কিন্তু তা ঈশ্বর প্রেম ও মহাসম্মানিত খোদা তাআলার মিলন লাভ ছাড়া কিছুতেই লাভ করা যায় না। পরজাতীয় লোকেরা যদি প্রকৃত জীবনের দার্শনিক তত্ত্ব অবগত হতো, তবে কখনো আত্মাকে স্বয়ম্ভু অনাদি অনন্ত স্বীয়শক্তি বলে সজীব ও প্রকৃত জীবন (মুক্তি) লাভে অসমর্থ বলে দাবী করতো না। ফলত মুক্তিজ্ঞান ও ঐশী জ্ঞান স্বর্গ

১২. মানুষ তার স্বাভাবিক দুর্বলতাবশত অসীম অনন্ত সম্পদ ও জীবন লাভের উপযোগী পুণ্য অর্জন করতে সক্ষম নয়। অসীম অনন্ত জীবন ছাড়া প্রকৃত মুক্তি হয় না। মানুষ যখন উপাসনা ও জপতপে তার গোটা শক্তি নিয়োজিত করত পূর্ণ পরিশ্রম করে, তখন রহমান রহীম খোদা (পরমদাতা ও পরমকরুণাময় পরমেশ্বর) এ দুর্বল মানবের প্রতি কৃপা পরবশ হয়ে তাকে সহায়তা করেন এবং বিনা মূল্যে খোদা দর্শন ও খোদা মিলনে মহাপুরস্কার প্রদান করেন। অনন্তকাল হতে তিনি সাধুদেরকে এরূপে পুরস্কৃত করেছেন, এখনও করছেন, ভবিষ্যতেও করবেন।

হতেই অবতীর্ণ। স্বর্গের লোকেরাই এর মূলতত্ত্ব অবগত। বিষয়মত্ত সংসারীদের সমীপে এ সত্য বিকশিত হয় না।

আবার মূল বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করে বলছি, ঈশ্বর মিলনই অনন্ত মুক্তি প্রবাহের উৎপত্তিস্থল। যিনি এ করুণা হতে জীবনবারি পান করেছেন তিনিই মুক্তি পেয়েছেন। কিন্তু পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণপ্রেম, পূর্ণ সততা ও পূর্ণ বিশ্বাস ছাড়া ঈশ্বর মিলন অসম্ভব। ঐশী জ্ঞানে কোন অপূর্ণতার কালিমা আরোপ না করাই পূর্ণ জ্ঞানের প্রথম নিদর্শন। আত্মা ও পরমাণুকে অনাদি অনন্ত বলে তারা খোদাকে সর্বজ্ঞ বলতে পারে না। আমি একথা ইতোপূর্বে প্রমাণ করেছি। এ কারণেই পথহারা গ্রীক দার্শনিকরা, আত্মাকে অনন্ত অনাদি বলতো এবং বলতো যে সূক্ষ্মতম শাখাপ্রশাখাসমূহ সম্বন্ধে পরমেশ্বরের জ্ঞান নেই। আত্মা ও পরমাণু অনন্ত অনাদি স্বয়ম্ভু হলে, এদের অস্তিত্ব খোদার অস্তিত্ব হতে উৎপন্ন না হলে তিনি যে এদের সূক্ষ্মতম শক্তি, গুণ বা ক্ষমতা সম্পূর্ণ অবগত আছেন একথা প্রমাণিত হয় না। নিজ হাতের তৈরী জিনিসের গোপনীয় অবস্থার বিশেষ ও বিস্তৃত জ্ঞান অর্জন করা যেমন সম্ভবপর, অপর জিনিসের জ্ঞানার্জন করা তেমন সম্ভবপর নয়। এতে ভুলভ্রান্তির যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। আত্মা ও পরমাণু সম্বন্ধে ঈশ্বরের জ্ঞান তাঁর নিজ অবস্থার অনুরূপ নয় অর্থাৎ তিনি যেমন পূর্ণ এ বিষয়ে তাঁর জ্ঞান তেমন পূর্ণ নয়, একথা আত্মাকে অনন্ত অনাদি বিশ্বাসকারীরা স্বীকার করতে বাধ্য। কেউ যদি বলে, এ বিষয়েও তাঁর পূর্ণ জ্ঞান আছে, তবে তাকে স্পষ্ট প্রমাণ ও যুক্তি দিয়ে এটা সুসিদ্ধ করতে হবে, শুধু দাবী করলেই চলবে না। আত্মা, অনন্ত অনাদি স্বয়ম্ভু হওয়া সত্ত্বেও কেন পরমেশ্বরের অধীন হলো? কোন যুদ্ধবিগ্রহের পর কি এ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল? অথবা তারাই কি বিশেষ কোন লাভের আশায় এ অধীনতা পাশ বরণ করে নিয়েছিল। এ বিশ্বাস মতে পরমেশ্বর কাউকে দয়াও করেন না, কারও প্রতি ন্যায়বিচারও করেন না। তিনি শুধু নিজ দুর্বলতা লুকাবার জন্য মুক্ত আত্মাকে নিত্য অনন্ত মুক্তি প্রদানে পরাঙ্মুখ। কারণ অনন্ত কালের জন্য মুক্তি প্রদান করলে এক একটি করে সময়ক্রমে সব আত্মাই মুক্তি পাবে, ঐশী রাজত্বের ঐশ্বর্য বজায় রাখার জন্য পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব থাকবে না। অতএব নিজ ঐশ্বর্য চিরস্থায়ী করার জন্য অবতার ঋষি বা সিদ্ধপুরুষের উচ্চপদপ্রাপ্ত আত্মাকেও অনন্তকালের জন্য মুক্তি প্রদান না করে পুনঃ পুনঃ জন্মের চক্রে আবর্তিত করেন। আচ্ছা, আমরা কি সর্বশক্তিমান পরম দয়ালু পরমেশ্বরকে এমন নীচমনা কল্পনা করতে পারি? তিনি তাঁর দাসগণকে দুঃখ দিয়ে নিজে আনন্দ উপভোগ করত কখনো কাউকেও নিত্য অনন্ত আনন্দ সুখ প্রদান করতে ইচ্ছা করেন না, আমরা কি পরম পবিত্র পরমেশ্বরকে তিলেকের জন্যও এমন অনুদার ও কৃপণ বলতে পারি? দুঃখের বিষয় খ্রিস্টানদের ধর্ম গ্রন্থেও এরূপ

কৃপণতার কথা পাওয়া যায়। তারা বলেন, যে ব্যক্তি ঈসাকে খোদা বলে অবিশ্বাস করবে, সে অনন্তকাল দোযখে থাকবে, কখনো কোন যুগেও তার উদ্ধার হবে না। কিন্তু খোদা তা'লা আমাদেরকে কখনো এমন শিক্ষা দেন নি। তিনি বলেছেন, কাফিররা দীর্ঘকাল কঠোর নরক যন্ত্রণা ভোগ করে অবশেষে তার দয়া ও করুণার অংশ প্রাপ্ত হবে। হাদীসে বর্ণিত আছে- **ইয়াতি 'আলা জাহান্নামা যামানুন লাইছা ফীহা আহাদুন ওয়া নাসিমুস্‌সবা তাহ্‌রিকু আবওয়াবাহা-** অর্থাৎ জাহান্নামে এমন এক যুগ আসবে, তখন কেউই তথায় বাস করবে না এবং প্রভাতের শীতল বায়ু এর দরজা হেলাতে থাকবে। এ হাদীসের অনুরূপ এক আয়াত কুরআন শরীফেও পাওয়া যায়। **ইল্লা মাশা-আ-রব্বুকা ফা-আলুল্‌লিমায়ুরীদ–** (সূরা হূদ : ১০৮) অর্থাৎ দোযখীরা অনন্তকাল দোযখে বাস করলেও অবশেষে খোদা তা'লা তাদেরকে ইচ্ছাপুর্বক উদ্ধার করবেন। কারণ তোমার রব্ব (সৃষ্টিকর্তা) রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা প্রভু যা ইচ্ছা করেন তা-ই সম্পন্ন করতে পারেন। এ শিক্ষা খোদা তা'লার পূর্ণগুণের অনুরূপ শিক্ষা। তাঁর সিফত (গুণ) দু প্রকার জালালী ও জামালী (শক্তিমূলক ও সৌন্দর্যমূলক) তিনিই আঘাত করেন, তিনিই মলম দেন।

দোযখে দাখিল হবার পর, অনন্তকাল পর্যন্ত সদা খোদার ক্রোধ দোযখীর ওপর বিকশিত হতে থাকবে, কখনো এর প্রতি তাঁর ক্ষমা ও করুণার উদ্রেক হবে না, ঐশী উদারতা ও দয়া গুণ চিরতরে বিনষ্ট হবে, এমন কথা বড়ই অসঙ্গত এবং এ মহা সম্মানিত পরমেশ্বরের পূর্ণ গুণসমূহের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। খোদা তা'লা নিজ পুস্তকে যা বলেন তাতে বুঝা যায়, দোযখী দীর্ঘকাল (যা মানব স্বভাবসুলভ দুর্বলতার অনুপাতে রূপকস্বরূপ আবাদান বা চিরকাল বলা হয়েছে) দোযখে বসবাস করলেও, খোদা তা'লার করুণা ও ক্ষমার আলোক তার উপর বিকাশ পাবে। তিনি নিজ হাত নরকের দিকে প্রসারিত করবেন ও আপন মুষ্টিতে যত লোকের সঙ্কুলান হবে তত লোককে নরক হতে উদ্ধার করবেন। এ হাদীসেও অবশেষে সব মানুষের মুক্তি লাভের প্রমাণ পাওয়া যায়।[১৩] কারণ খোদার মুষ্টিও খোদার মতই অসীম ও অনন্ত। কোন নরকবাসীও মুষ্টির বাইরে থাকবে না। যেমন, তারকারাজি আকাশমন্ডলে ক্রমান্বয়ে উদিত হয়, তেমন খোদা তা'লার গুণরাজিও ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয়। কোন যুগে মানব পরমেশ্বরের শক্তিমূলক

---

১৩. খোদা তাআলা যেমন অনন্তকাল জীবিত থাকবেন, দোযখীকেও ঠিক তেমন অনন্তকাল জীবিত রেখে শুধু নরক যন্ত্রণার কঠোর শাস্তি ভোগ করাবেন, এমন কথা বড়ই অসঙ্গত। তার পাপে খোদাও একেবারে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত নন। কারণ তিনিই তার দুর্বল গুণগুলো সৃষ্টি করেছেন। অতএব মানুষ ন্যায়সঙ্গতভাবে ঈশ্বর প্রদত্ত দুর্বলতার সুফল লাভের অধিকারী।

গুণাবলী ও ব্যক্তিগত আত্মপূর্ণতার (অর্থাৎ রুদ্রগুণের) কিরণতলে নিপতিত হয়, আবার কখনো কখনো তাঁর সৌন্দর্যমূলক গুণাবলীর আলোক রাশি তার ওপর উদ্ভাসিত হয়। এরই প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহ্ তাআলা কুরআন শরীফে বলেছেন, **কুল্লা ইয়াওমিন হুয়া ফী শান–** (সূরা রহমান : ৩০)। অতএব নরকে নিক্ষিপ্ত হবার পরক্ষণ হতেই অপরাধীদের জন্য পরমেশ্বরের উদারতা ও দয়াগুণ চিরতরে বিনষ্ট হবে, পুনরায় কোন যুগেই বিকশিত হবে না এমন ধারণা বিষম লজ্জাজনক ধারণা। ঐশী গুণের বিনাশ ও বিলোপ নেই। পরমেশ্বরের মৌলিক গুণ প্রেম ও দয়া। এটা তাঁর সব গুণের প্রসূতি। মানব-দোষ সংস্কারকল্পে সময় সময় এ প্রেম, শক্তি ও ক্রোধব্যঞ্জক রূদ্র গুণাকারে উত্থোলিত হয়, দোষ সংশোধনের পর আবার নিজরূপে বিকশিত হয়ে ঐশী দানস্বরূপ চিরতরে তার সহায় হয়। খোদা তাআলা কোন খিট্খিটে মেযাজের মানুষের মত নন। তিনি কাউকেও অনর্থক শাস্তি দেন না। কাউকেও অত্যাচার করেন না। মানুষ নিজ নিজ জীবনের ওপর যুলুম করে। তার প্রেমেই মুক্তি, তার বিচ্ছেদেই শাস্তি।[১৪]

এই তো জ্ঞান সম্বন্ধে আর্য্য সমাজের শিক্ষা। কোন ব্যক্তি পরমেশ্বর সমীপে কোন বিশেষ সম্মান লাভ করলে, অবতার ঋষি অথবা যার ওপর বেদগ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছিল এমন লোক হলেও তার সম্মানের স্থায়িত্বের যে কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই– এ শিক্ষা মতে তা স্বীকার করে নিতে হয়। কেননা, তিনি পরমেশ্বরের প্রিয়তম ও তাঁর নৈকট্য লাভের অধিকারী হলেও, সম্মানের সিংহাসন হতে বিচ্যুত হবেন। পুনর্জন্মের চক্রে পড়ে কীটপতঙ্গ প্রভৃতি নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হবেন। কখনো অনন্ত মুক্তি লাভে সক্ষম হবেন না। এদিকে মরণ যাতনা ওদিকে জনম যাতনা। এরূপে বার বার যাতনা দিয়ে পরমেশ্বর নিজ স্বত্ব আদায় করবেন। এদিকে আত্মা পরমাণু অনাদি অনন্ত স্বয়ম্ভু। সুতরাং পরমেশ্বরের অংশীদার, ওদিকে তিনি এত কৃপণ ও অনুদার যে শক্তি থাকতেও অনন্ত মুক্তি দিবেন না।

আবার নিয়োগ প্রথা দ্বারাই বেদ বিধান হতে মানবজীবন কতদূর পবিত্র ও নির্মল হওয়া আবশ্যক তা বেশ বুঝা যায়। এ প্রথানুসারে আর্য্যসমাজ তাদের বিবাহিতা সহধর্মিণীদেরকে পরপুরুষের সাথে সন্তানোৎপাদনের জন্য সহবাস করাতে অনুমোদনপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং একাদশ সন্তান জন্মগ্রহণ না করা পর্যন্ত তাদের

১৪. মুক্তিপ্রাপ্ত নর ও নারীরা সবাই বাস্তবিকই সমপদ বিশিষ্ট হবে এমন নয়। যারা দুনিয়াতে খোদা তাআলাকেই অবলম্বন করেছিল, খোদার প্রেমেই মোহিত হয়েছিল ও সরল পথে সুদৃঢ় ছিল, তারা এমন বিশেষ উচ্চপদসমূহ লাভ করবে, যাতে অন্যেরা পৌঁছুতে সমর্থ হয় নি।

স্ত্রীরা পরপুরুষের সাথে প্রত্যহ সহবাস করতে পারবেন। আমি এ অসংলগ্ন কথা ত্যাগ করে মূল বিষয়ে প্রত্যাবর্তন করত বলছি, আর্য্যসমাজের মৌলিক বিশ্বাস মতে তাদের পরমেশ্বর অন্তর্যামীও নন সর্বজ্ঞও নন। তাদের সমীপে তাঁর সর্বজ্ঞতার কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না।

খ্রিষ্টানদের ধর্ম বিশ্বাসমতেও পরমেশ্বর সর্বজ্ঞ হন না। কেননা, যিশুখ্রিষ্টই তাদের ঈশ্বর কিন্তু তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন– ঈশ্বরপুত্র হওয়া সত্ত্বেও তার পুনরুত্থান দিবসের সঠিক জ্ঞান নেই। অতএব স্বয়ং পরমেশ্বর পুনরুত্থান দিবসের (রোজ কিয়ামতের) সময় নির্ণয়ে অক্ষম, বাধ্য হয়ে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে হয়।

পূর্ণ ও প্রকৃত মা'রেফতের দ্বিতীয় শাখা হলো খোদা তাআলার পূর্ণ শক্তির জ্ঞান। কিন্তু এস্থলেও আর্য্য সমাজ ও পাদরী সাহেবরা নিজ নিজ পরমেশ্বরের প্রতি কালিমা আরোপ করেন।

আর্য্য সমাজের মতে পরমেশ্বর আত্মা ও পরমাণু সৃষ্টি করতে পারেন না। কোন আত্মাকে অনন্ত মুক্তি প্রদান করতে সক্ষম নন।[১৫]

পাদরী সাহেবরা তাদের পরমেশ্বরকে সর্বশক্তিমান বলতে পারেন না। কারণ তিনি তার শত্রুদের হাতে মার খেয়েছেন, বেত্রাহত হয়েছেন, ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন। সর্বশক্তিমান হলে এমন লাঞ্ছনা ভুগতেন না। সর্বশক্তিমান হলে নিজ দাসদের মুক্তি সাধনের জন্য নিজ প্রাণ বিনাশের আবশ্যকতা হতো না। যিনি খোদা হয়েও তিন দিন মৃত ও প্রাণহীন থাকলেন, তাকে সর্বশক্তিমান বলা লজ্জার বিষয়। স্বয়ং পরমেশ্বর তিন দিন যাবৎ নির্জীব ও শেষ যাত্রার পথিক ছিলেন। কিন্তু তারই সৃষ্ট জীবজন্তুরা তৎকালেও সতেজ ও সজীব ছিল, এটা আরো আশ্চর্যের বিষয়।

---

১৫. বড়ই ধন্যবাদ ও আনন্দের বিষয় এই, আমাদের খোদা তাআলা, আমাদের ঈমান ও বিশ্বাস সতেজ ও অটুট রাখর জন্য, সব সময়েই নিজ ক্ষমতা ও শক্তির নিদর্শন প্রকাশ করে থাকেন। বসন্তকালে পাঞ্জাবে এক ভীষণ ভূমিকম্প হবে, এ সংবাদ ১৯০৫ সনের ৪ঠা এপ্রিলের ভূমিকম্পের পূর্বে চার বার ভিন্ন ভিন্ন সময়, নিজ ওহী ও আকাশবাণী যোগে, তিনি আমাকে জ্ঞাত করেছিলেন। তদনুসারে ১৯০৫ সনের ৪ঠা এপ্রিল মঙ্গলবার প্রাতে সেই ভীষণ ভূমিকম্প হয়ে গেছে এবং তখন বসন্তকালই বিদ্যমান ছিল। সর্বশক্তিমান খোদা আমাকে সংবাদ দিয়েছিলেন, আবার বসন্তকালে ভীষণ ভূমিকম্প হবে। তদনুসারে ১৯০৬ সনে ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ঠিক বসন্তকালে ভূমিকম্প হয়েছে। এর ধাক্কা মন্‌সূরা পাহাড়ে এতই ভীষণ ছিল যে মানুষ সংজ্ঞাহীন হয়েছিল। আবার এ বসন্তকালেই আমেরিকার কোন কোন অংশে ভীষণ ভূমিকম্প হয়েছে ও এতে কয়েকটি শহর ধ্বংস হয়েছে। অতএব প্রকৃত খোদা বা পরমেশ্বর তিনি, যিনি এখনও ওহী যোগে আমাদের প্রতি নিজ জীবন্ত শক্তি প্রকাশ করেছেন। এরূপ আরও সহস্র সহস্র ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান আছে যা তাঁর ওহী যোগে আমার নিকট প্রকাশিত হয়েছিল ও সময় মত পূর্ণ হয়েছে।

আর দেখুন ওদের তৌহীদ বা একত্ববাদ। আর্যসমাজ পরমাণু ও আত্মাকে স্বয়ম্ভু স্বীকার করে এদেরকে পরমেশ্বরের অংশীদার করত এদের অস্তিত্ব ও শক্তি সম্পূর্ণরূপে শুধু এদেরই ওপর আরোপ করছে। অবশ্য এটাও বহু ঈশ্বরবাদ। আর খ্রিস্টানগণ একেশ্বরবাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিশ্বাসই পোষণ করছে।[১৬] তারা বলে, খোদা তিন ব্যক্তি পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা এবং 'আমরা তিনকেই এক জ্ঞান করি'– একথা বলে একত্ববাদ প্রমাণ করতে চেষ্টা পায়। কিন্তু এ চেষ্টা বিফল। কারণ তাদের মতেই এ তিন খোদার প্রত্যেকেই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র এবং প্রত্যেকেই পৃথকভাবে পূর্ণ খোদা। অতএব তিনই এক– কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এমন অর্থশূন্য উত্তর যুক্তিসঙ্গত বলে মানতে পারে না। কোন্ গণিত বিদ্যানুসারে এ তিন এক হবে? এমন গণিত কোন্ স্কুল বা কলেজে শিক্ষা দেয়া হয়? এমন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র তিন, এক কেমনে হবে, তা কোন বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক কি বুঝতে পারবেন? যদি বল, এটা মানববুদ্ধি বহির্ভূত নিগূঢ়তম রহস্য, তবে একে শুধু এক প্রতারণা, ছলনা ও ধোঁকাবাজী বলে স্বীকার করতে হবে। কারণ মানুষের বুদ্ধিও কথা বেশ বুঝতে সক্ষম। তিন ব্যক্তিকে তিন পূর্ণ খোদা বললে এ তিনকে সর্বদা তিনই বলতে হবে, কখনো এক বললে চলবে না।

আর কেবল কুরআনেই যে ত্রিত্ববাদের প্রতিবাদ পাওয়া যায় এমন নয়। তওরাত কিতাবেও এর খন্ডন বিদ্যমান। যে তওরাত মূসা (আ:) নবীর কাছে অবতীর্ণ হয়েছিল তাতে ত্রিত্ববাদের কোন উল্লেখ নেই, এমন কি এর নাম গন্ধও নেই। একত্ববাদ স্মরণ রাখার জন্যে ইহুদীদেরকে বিশেষভাবে আদেশ দেওয়া হয়েছিল, প্রত্যেক ইহুদী কলেমা তৌহীদ (একত্ববাদ মন্ত্র) মুখস্থ করবে। নিজ নিজ গৃহের চৌকাঠে লিখে রাখবে। পুত্র-কন্যাদেরকে শিক্ষা দিবে। আবার

---

১৬. কুরআন শরীফের শিক্ষামতে খোদা তাআলা আত্মা সৃষ্টি করেছেন। ইচ্ছা করলে এদেরকে ধ্বংসও করতে পারেন। মানবাত্মা শুধু তাঁর দয়াতেই অনন্ত জীবনপ্রাপ্ত হয়। এরা নিজ নিজ ব্যক্তিগত শক্তিবলে অনন্তকাল বাঁচতে পারে না। তাই যারা খোদাকে পূর্ণপ্রেমে প্রেম করে, তাঁর আদেশ পূর্ণরূপে পালন করে, সব সময় তাঁর আজ্ঞাবহ থাকে, কৃতজ্ঞতা ও পুর্ণ সততাসহ তাঁরই ছায়াতে সব সময় অবনত মস্তক থাকে, তিনি তাদেরকে এক বিশেষ উৎকর্ষপূর্ণ জীবন প্রদান করেন। ইহলোকেই তাদের স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়গুলোকে বিশেষ সতেজ ও বলবান করেন। তাদের প্রকৃতিতে এমন এক নূর বা জ্যোতি সৃষ্টি করেন, এর বলে তাদের স্বভাবে নবজ্যোতি ও নতুন আলোক জ্বলে উঠে। মরণের পর ইহলোক অর্জিত ও আধ্যাত্মিকশক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং তারা ঈশ্বরপ্রদত্ত ঐশী সম্বন্ধ বলে আকাশে উন্নীত হয়। একেই শরীয়তের ভাষায় 'রাফা' বা স্বর্গারোহণ বলে। কিন্তু যে ব্যক্তি কাফির বা অবিশ্বাসী হয়, যার সম্বন্ধ খোদার সাথে পবিত্র ও নিষ্পাপ নয়, সে এ জীবন লাভে সমর্থ হয় না। সে সজীব নয়, সে মৃত ও নির্জীব। খোদা তাআলা যদি আত্মার সৃষ্টিকর্তা না হতেন, তবে স্বীয় শক্তিবলে মু'মিন ও কাফিরের (বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর) মাঝে এই পার্থক্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হতেন না।

একত্ববাদ স্মরণ করাতেও এরই প্রচলন বজায় রাখতে পয়গম্বরগণ ইহুদী সমাজে ক্রমাগত একাদিক্রমে জন্মেছিলেন। এত সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও এবং ক্রমান্বয়ে এত পয়গম্বরের আগমনেও ইহুদীরা একত্ববাদ ভুলে ভুলক্রমে ত্রিত্ববাদে পৌঁছেছিল। আর এটা নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছিল, সন্ত ানদেরকে শিক্ষা দিয়েছিল। আর কেবল শত শত নবী এ তৌহীদই প্রচলিত ও সজীব রেখেছিলেন- এমন ধারণা বুদ্ধি ও কল্পনার একবারে সম্পূর্ণ বিপরীত ও একবারে সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমি কোন কোন ইহুদীকে এ সম্বন্ধে হলফ দিয়ে জিজ্ঞেস করেছি, 'বলুন তো আপনাদের তওরাত কিতাবে কি কখনো কোন জায়গায় ত্রিত্ববাদের শিক্ষা দেয়া হয়েছিল?' এ কথার উত্তরে তারা লিখেছেন, তওরাত কিতাবে ত্রিত্ববাদের নাম গন্ধ নেই। খোদা তাআলা সম্বন্ধে কুরআন ও তওরাতের শিক্ষা অভিন্ন। অতএব যে ত্রিত্ববাদ কুরআনেও নেই, তওরাতেও নেই, এতে যে জাতির দৃঢ়বিশ্বাস, তাদের জন্য কত পরিতাপ! আসলে ইঞ্জীলে (বাইবেলেও) যে ত্রিত্ববাদ নেই এটাও সম্পূর্ণ সত্য। ইঞ্জীলে যেসব জায়গায় খোদা তাআলার উল্লেখ আছে, সেসব জায়গায় ত্রিত্ববাদের কোন ইঙ্গিতই নেই। শুধু এক-অদ্বিতীয় অংশবিহীন 'ওয়াহেদ লা শরীক' খোদারই উল্লেখ পাওয়া যায়। ইঞ্জীলে (বাইবেলে) যে ত্রিত্ববাদ নেই বড় বড় বিরুদ্ধবাদী পাদরীগণ তা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। তবে এখন প্রশ্ন হতে পারে, খ্রিষ্টান ধর্মে ত্রিত্ববাদ কোথা হতে এলো। খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী মহাপন্ডিতগণ এর উত্তরে বলেছেন, এ ত্রিত্ববাদ গ্রীক জাতির ধর্মবিশ্বাস হতে ধার করে নেয়া হয়েছে। যেমন হিন্দুরা ত্রিমূর্তি বিশ্বাস করে, তেমন গ্রীকরাও ত্রিদেবতা বিশ্বাস করতো। খ্রিষ্টান হয়ে সেন্ট পল ভাবলেন, যেরূপেই পারি স্বজাতি গ্রীকদেরকে খ্রিষ্টান করবো। তাই তিনি খ্রিষ্টান ধর্মে তাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্যে, তাদের ত্রিদেবতার স্থলে 'আকনুম' প্রবেশ করালেন। নতুবা 'আকনুম' কাকে বলে যিশুখ্রিষ্ট নিজেও তা মোটেই জানতেন না। হযরত ঈসা অন্যান্য নবীর ন্যায় সরল একত্ববাদ শিখাতেন। তাঁদের মত তিনিও বলতেন, খোদা এক-অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক বা অংশীদার নেই। বস্তুত অধুনা যে ধর্ম জগতে খ্রিষ্টান ধর্ম নামে পরিচিত সে ধর্ম হযরত ঈসা বা যিশু খ্রিষ্টের ধর্ম নয়, বরং সেন্টপল কল্পিত পৌলসী ধর্ম। যতদিন ঈসা নবী বেঁচে ছিলেন ততদিন তিনি এক-অদ্বিতীয় অংশীবিহীন 'ওয়াহেদ লা-শরীক' খোদা তাআলার উপাসনা শিখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর, তাঁর সহোদর ভ্রাতা মহাপুরুষ ইয়াকুব প্রথম খলীফা বা উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। তিনিও একত্ববাদ শিখাতেন। কিন্তু পৌল তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে তাঁর বিশুদ্ধ ও সত্য বিশ্বাসসমূহের সম্পূর্ণ প্রতিকূলে নিজ শিক্ষা প্রদান করতে আরম্ভ করলেন ও নিজ মনগড়া মত ও কথাগুলো বাড়াতে বাড়াতে এক নয়া ধর্ম

গড়ে বসলেন। তিনি নিজে এক পৃথক দল গঠন করত তওরাত অনুসরণ হতে এ দলকে ফিরিয়ে আনলেন এবং এরূপ শিক্ষা দিতে শুরু করলেন যে যিশুর কাফ্ফারা বা প্রায়শ্চিত্তের পর হতে তাদের জন্যে আর কোন ঐশী আইন কানুন বা শরা-শরীয়ত পালন করার আবশ্যকতা নেই। যিশুর রক্তেই সব পাপ দূরীভূত হবে। তওরাত গ্রন্থও মেনে চলার প্রয়োজন নেই। তিনি আরও এক নব অপবিত্রতা খ্রিষ্টধর্মে দাখিল করে শূকর খাওয়া হালাল ও বিধিসম্মত করলেন। হযরত ঈসা ইঞ্জীলে শূকরকে নাপাক ও অপবিত্র নির্ধারিত করেছেন। বাইবেলে লিখিত আছে, 'মুক্তাগুলো শূকরের সামনে ছড়িয়ো না'। তিনি পবিত্র শিক্ষাকে মুক্তা বলেছেন। সুতরাং অপবিত্রতাকেই যে শূকর বলেছেন তা বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। যেমন আজকাল ইউরোপীয় জাতিগণ শূকর খায় তেমন সেকালে গ্রীকরাও শূকর খেত। এই গ্রীকদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্যই তিনি নিজ দলকে শূকর খেতে অনুমতি দিলেন। কিন্তু তওরাতে লিখিত আছে– শূকর সর্বদাই হারাম, একেতো স্পর্শ করাও নিষিদ্ধ। এ ধর্মের সব কদাচার সাধু পৌল থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। নতুবা মসীহ্ (খোদা হবার দাবী দূরের কথা) এত নিঃস্বার্থ মহাপুরুষ ছিলেন যে কেউ তাকে সাধু বলুক এমনও তিনি চাইতেন না। কিন্তু পৌল তাঁকে স্বয়ং পরমেশ্বরের পদে উন্নীত করেছেন। ইঞ্জীলে লিখিত আছে, কেউ তাকে সাধু অধ্যাপক বলে আহ্বান করায় তিনি বলেছিলেন– কেন আমাকে সাধু বলছো? তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করার কালে তিনি যে কথা বলেছিলেন, এতেও খোদা তাআলার একত্ববাদই প্রকাশিত হয়। তখন তিনি অতি কাতরতাসহ বলেছিলেন, 'এলী, এলী, লামা, সবক্তানী' হে আমার খোদা, হে আমার খোদা, কেন আমায় পরিত্যাগ করেছ? যিনি এত বিনয় ও নম্রতাসহ খোদাকে ডাকেন ও প্রকাশ করেন যে খোদাই তাঁর সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা প্রভু। তিনিই আবার নিজেকে খোদা দাবী করে বেড়াতেন কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি এমন কথা কল্পনা করতে সক্ষম হয়?

মূল সত্য এই, যাদের সাথে খোদা তাআলার ব্যক্তিগত প্রেম-সম্বন্ধ বিদ্যমান তাদের সাথে অনেক সময় তিনি রূপক ভাষায় কথা বলেন। অজ্ঞ লোকেরা এ রূপক কথা শুনে তাঁদের খোদা বলে প্রমাণ করতে চায়। যেমন তিনি আমার সাথে যিশুখ্রিষ্ট অপেক্ষা অনেক বেশি কথা বলেছেন[১৭] তিনি আমাকে সম্বোধন

---

১৭. একদা আমি কাশ্ফে (আধ্যাত্মিক দর্শনে) দেখেছি, আমি নতুন আকাশ নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করলাম। আবার বললাম, চল এখন নতুন আদম সৃষ্টি করি। এতে অজ্ঞ মৌলবীগণ চেঁচিয়ে বলতে লাগল, দেখ এ ব্যক্তি খোদায়ী দাবী করেছে; কিন্তু এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা এই, আমাকে দিয়ে খোদা তাআলা দুনিয়াতে এমন অসাধারণ পরিবর্তন আনয়ন করবেন, এতে মনে হবে যেন নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী সৃষ্টি হলো ও নতুন আদম জন্ম হলো। এরূপে তিনি আমাকে সম্বোধন করে

করে বলেছেন, 'ইয়া কমরু, ইয়া শাম্‌সু আন্‌তা মিন্নি ও আনা মিন্‌কা'– হে চন্দ্র, হে সূর্য! তুমি আমা হতে ও আমি তোমা হতে। এখন এ বাক্যের অর্থ যে যা ইচ্ছা করুক না কেন, প্রকৃত অর্থ এই, প্রথমত খোদা আমাকে চাঁদ বানিয়েছেন, আমি চাঁদের মত প্রকৃত সূর্য হতে জ্যোতি আহরণ করে প্রকাশিত হয়েছি। আবার তিনিই চাঁদ হয়েছেন কারণ তাঁর শক্তি ও জ্যোতি জগতে আমা দ্বারাই প্রকাশিত হয়েছে ও হবে। হযরত ঈসা (আ:)-এর সহোদর ভাই মরিয়ম তনয় ইয়াকূব পরম ধার্মিক ন্যায়পরায়ণ মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি সব বিষয়েই তওরাত কিতাব মতে কাজ করতেন। খোদা তা'লাকে অদ্বিতীয় অংশীবিহীন 'লা শরীক' জানতেন। শূকর খাওয়া হারাম নির্দেশ করতেন। বায়তুল মোকাদ্দসকে কিবলা মেনে নতুন আদেশে সে দিকে মুখ করে নামায পড়তেন। ন্যায়সঙ্গতভাবে নিজেকে এক ইহুদী বলে গণ্য করতেন। শুধু হযরত ঈসাকে নবী বলতেন। কিন্তু পৌল বায়তুল মোকাদ্দসের প্রতিও ঘৃণা সঞ্চার করালেন। অবশেষে খোদার আত্মসম্মান জ্ঞান তাঁকে গ্রেফতার করলে এক রোম সম্রাট তাকে ক্রুশে দিয়ে হত্যা করে ফেলে। এরূপে তার জীবনলীলা সাঙ্গ হয়। হযরত ঈসা (আ:) সত্যবাদী ও পয়গম্বর ছিলেন বলে ক্রুশবিদ্ধ হয়েও প্রাণে বেঁচেছিলেন। কিন্তু পৌল সত্য পরিত্যাগ করে ক্রুশে জীবন হারালেন।

মনে রাখবেন যতদিন হযরত ঈসা জীবিত ছিলেন, ততদিন পৌল তাঁর প্রাণের শত্রু ছিল। তাঁর মরণের পর তিনি খ্রিষ্টান হলেন। ইহুদী ইতিহাসে লিখিত আছে, তিনি কতগুলো বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই ঈসায়ী হয়েছিলেন। ইহুদীরা উক্ত স্বার্থপূর্ণ উদ্দেশ্যগুলো পূরণ করল না বলেই তিনি তাদের অনিষ্টকল্পে খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করলেন ও ঘোষণা করলেন, আধ্যাত্মিক দর্শনে যিশুখ্রিষ্টের দর্শন লাভ করে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। তিনিই সর্বপ্রথম দামেস্ক শহরে ত্রিত্ববাদ বিষয়ক বৃক্ষ রোপণ করেন। পৌলীয় ত্রিত্ববাদ দামেস্ক শহর হতে শুরু হয়। এরই দিকে লক্ষ্য রেখে হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে আগমনকারী মসীহ্‌ দামেস্ক শহরের পূর্বদিকে আবির্ভূত হবেন।[১৮] এ হাদীসের মর্ম এই, তাঁর আগমনে

বলেছেন, **আন্‌তা মিন্নী বি-মান-যিলাতী আউলাদী আন্‌তা মিন্নী বি মান যিলাতীল্‌ লা ইয়ালামু হাল খল্‌ক**- তুমি আমার পুত্র স্থানীয় তোমার সাথে আমার যে নিগুঢ় সম্বন্ধ তা দুনিয়ার লোকেরা জ্ঞাত নয়। একথা শুনে মৌলবাদীগণ অধীর হয়ে বলতে লাগল, এখন আর এর কাফির হবার সন্দেহ কি? কিন্তু **ফাযকুরুল্লাহা কা যিকরীকুম আবাআকুম**– (সূরা বাকারা : ২০১) কুরআনের এ আয়াত তাদের স্মরণ পথে উদিত হলো না।

১৮. এটা স্মরণ রাখা কর্তব্য, আমার আবাসভূমি কাদিয়ান দামেস্কের ঠিক পূর্বদিকে অবস্থিত। অতএব হযরত (স:) যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা পূর্ণ হয়েছে।

ত্রিত্ববাদের অবসান ও একত্ববাদের আকর্ষণ আরম্ভ হবে। পূর্বদিকে মসীহ্ অবতরণ করবেন, এ কথার আভাস এই আলোক যেমন আঁধারের ওপর প্রবল হয় তেমন মসীহ্ তাঁর শত্রুগণের ওপর বিজয়ী হবেন।

সত্য সত্যই সাধু পৌল হযরত মসীহ্র পর নবীরূপে অবতীর্ণ হলে (যেমন খ্রিষ্টানরা মনে করেন) হযরত ঈসা (আ:) তার আগমনের কিছু না কিছু সংবাদ নিশ্চয়ই প্রদান করেছেন। বিশেষত যখন তিনি হযরত ঈসার জীবিতকালে তাঁর প্রাণের শত্রু ছিলেন, তাঁকে দুঃখ দিতে নানারূপ ষড়যন্ত্র করতেন, তখন এমন লোক সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী না থাকলে কিরূপে তাকে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত বলে গণ্য করা যুক্তিসঙ্গত হবে। তাকে বিশ্বাস করার জন্য নিম্নলিখিত মর্মে ভবিষ্যদ্বাণী থাকা আবশ্যক ছিল, যদিও পৌল, আমার জীবনকালে প্রাণের দুশমন ছিল, আমাকে ক্রমাগত দুঃখ দিয়েছিল, তথাপি আমার মরণের পর সে খোদার রসূল ও পবিত্র মহাপুরুষ হবে। তিনি মূসার তওরাতের প্রতিকূল নিজস্ব বিধি ও শিক্ষা প্রচলন করলেন, শূকর খেতে অনুমতি দিলেন। যে খতনার (লিঙ্গাগ্র ত্বক ছেদন প্রথার) হুকুম তওরাত কিতাবে বিশেষভাবে দেয়া হয়েছিল, যা পয়গম্বরগণ সবাই এমন কি স্বয়ং যীশুখ্রিষ্টও পালন করেছেন, সেই ঐশী আদেশও রহিত ও বাতিল করলেন। তওরাতের আদেশ বাণী ও নিষেধাজ্ঞা মান্য করা অনাবশ্যক নির্দেশ করলেন। বায়তুল মুকাদ্দসকে কিবলা পরিত্যাগ করে এ থেকেও মুখ ফিরালেন। মূসার শরীয়ত উলট-পালট করলেন। তার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীর একান্তই আবশ্যকতা ছিল। অতএব পৌলের পয়গম্বর হওয়ার যখন কোন ভবিষ্যদ্বাণীই বাইবেলে নেই বরং তিনি যে হযরত ঈসার পরম শত্রু ছিলেন তা-ই লিখিত আছে এবং তিনি তওরাতের চিরন্তন প্রথার যখন একান্ত বিরোধী ছিলেন, তবে কেন তাকে ধর্মনেতা ও ধর্মগুরু করা হলো! এ সম্বন্ধে কি কারও কাছে কোন প্রমাণাদি আছে?

জ্ঞানের পর প্রেমই মুক্তির জন্য সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। কেউই আপন প্রেমিককে শাস্তি দিতে চায় না। প্রেম প্রেমাকর্ষণ করে প্রিয়তমকে করে আসক্ত। কেউ যদি কাউকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে তবে তার দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত এ প্রিয়জন তার শত্রুতা করতে পারে না। কেউ কাউকে যদি অন্তর দিয়ে ভালোবাসে নিজ প্রেম প্রিয়তমকে জ্ঞাপন না-ও করে, তবুও এ ভালোবাসার ফলে সে ব্যক্তি অন্তত তার দুশমন হবে না। হৃদয় হতে হৃদয়ান্তরে প্রেম সঞ্চারণের পথ আছে। খোদার নবী, পয়গম্বর ও অবতারদের এমন এক প্রবল আকর্ষণী শক্তি আছে। এতে সহস্র সহস্র নরনারী আকৃষ্ট হয়ে তাদেরকে এত প্রেম করে যে তাদের জন্য প্রাণ বিসর্জন করতে অভিলাষী ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়। এর কারণ এই, তাদের হৃদয়ে

মানবের উপকারিতা ও সহানুভূতির ভাব এত প্রবল যে তারা মায়ের চেয়েও অধিক স্নেহে মানব জাতিকে স্নেহ করেন এবং নিজেরা দুঃখকষ্টে পড়ে তাদের সুখ কামনা করতে থাকেন। তাদের এ অকৃত্রিম প্রেমাকর্ষণ শক্তি সৎ হৃদয়সমূহকে ক্রমে ক্রমে আকর্ষণ করতে আরম্ভ করে। অজ্ঞ হয়েও মানুষ পর-প্রেমের সন্ধান পায়। সর্বজ্ঞ হয়েও কি পরমেশ্বর কোন প্রকৃত প্রেমিকের প্রেম সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকবেন? প্রেম আশ্চর্য বস্তু। প্রেমানলে পাপ জ্বলে ভস্মীভূত হয়। শাস্তি অকৃত্রিম ও ব্যক্তিগত পূর্ণ প্রেমসহ একত্র অবস্থান করতে পারে না। কিন্তু প্রকৃত প্রেম বিশেষ লক্ষণযুক্ত। প্রকৃত প্রেমিকের হৃদয়ফলকে প্রিয়তম-বিচ্ছেদ ভয় বিশেষভাবে অঙ্কিত থাকে। সে অতি সামান্য দোষ করলেও নিজেকে ধ্বংসের মুখে পতিত মনে করে। প্রিয়তমের বিরুদ্ধাচরণ বিষবৎ পরিত্যাগ করে। প্রিয়তমের সাথে মিলনের জন্য অতি অধীর থাকে। প্রিয়তম হতে দূরে থাকার দুঃখ মৃত্যুবৎ জ্ঞান করে। সে জনসাধারণের মত চুরি, খুন, ডাকাতি, ঝগড়া-বিবাদ, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রভৃতিকেই পাপ গণ্য করে সন্তুষ্ট থাকে না বরং সে খোদাকে ছেড়ে যৎসামান্য অমনোযোগ ও জড়তা পরের পানে মনাকর্ষণ করে একেও মহাপাপ মনে করে। এ জন্যই সে অনন্ত ও নিত্য প্রিয়তম সমীপে ক্ষমা প্রার্থনায় সদাসর্বদা রত থাকে। কোন কালেই ঈশ্বর-বিচ্ছেদ তার স্বভাবে সয় না। সুতরাং মানব স্বভাবসুলভ দুর্বলতাবশত সামান্য অমনোযোগ প্রকাশ পেলেও একেই পর্বত প্রমাণ পাপ মনে হয়। এ জন্যই, যারা খোদা তাআলার সাথে পূর্ণ ও পবিত্র সম্বন্ধে সংবদ্ধ তারা সব সময় ইস্তিগফারে বা ক্ষমা প্রার্থনায় রত থাকেন। প্রকৃত প্রেমিকের হৃদয়ে প্রিয়তমের অসন্তোষ ভয় সর্বদা জাগরূক থাকে। খোদাকে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট ও রাজী করার প্রবল বাসনা তার হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে। এমন কি যদি কোন সময় খোদা তাকে এমন কথা বলে দেন, 'আমি তোমার প্রতি রাজী ও সন্তুষ্ট আছি' তথাপি তিনি এতে ক্ষান্ত ও নির্ভয় হন না। যেমন মদ্যপায়ী মদ্যপান কালে একবার পান করে ক্ষান্ত হয় না, নেশায় বিভোর হয়ে পুনঃ পুনঃ পান করতে চায়, তেমনি মানব হৃদয়ে প্রেমের ফোয়ারা যখন ফুটে উঠে তখন সে ক্রমেই খোদা তাআলার অধিকতর সন্তুষ্টকরণে ব্যগ্র হয়। এটাই প্রেমের স্বভাব। অতএব প্রেম যতই বাড়বে ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা ততই অধিক হবে। এজন্যই যারা খোদাকে পূর্ণ প্রেমে প্রেম করে তারা মুহূর্তে, দমে দমে ইস্তিগফার করে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নিষ্পাপ মহাপুরুষের লক্ষণ এই, তিনি সর্বাধিক ক্ষমা প্রার্থনায় রত থাকেন। মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতাবশত যে ভ্রম-প্রমাদ ও ত্রুটি সাধন সম্ভবপর ভবিষ্যতে তা দূরীভূত করার জন্য খোদা তাআলার সাহায্য প্রার্থনাই ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা। এতে বর্ণিত দুর্বলতা খোদার দয়াতে বর্দ্ধিত ও বিকশিত না হয়ে অজ্ঞান ও লুকান থাকে।

জনসাধারণের জন্য ইস্তিগফারের অর্থ আরো প্রশস্ত। ইতোপূর্বে যে সব দোষ-ক্রটি হয়েছে, সেগুলোর কুফল ও বিষময় প্রভাব হতে, আমাকে রক্ষা কর, এটাই ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা। অতএব মহা সম্মানিত প্রবল প্রতাপান্বিত খোদা তাআলার ব্যক্তিগত প্রেমই প্রকৃত মুক্তির উৎপত্তিস্থল। এ ব্যক্তিগত ঈশ্বরপ্রেম, বিনয় ও নম্রতা, অবিরাম ক্ষমা প্রার্থনা দ্বারা খোদার প্রেম আকর্ষণ করে। মানব যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং প্রেমানলে যাবতীয় সংসারাসক্তি জ্বলে যায় তখন অকস্মাৎ খোদা-প্রেম অগ্নিস্ফূলিঙ্গবৎ তার হৃদয়ে অবতীর্ণ হয় ও তাকে পার্থিব জীবনের সব অপবিত্রতা হতে উদ্ধার করে নেয়। চিরঞ্জীবী- জীবনদাতা, 'হাইয়ুন' 'কাইয়ুম' খোদা তাআলার পবিত্রতার রঙে তার আত্মা ও জীবন রঙীন হয়। তিনি খোদার পূর্ণ গুণাবলীর অংশ ছায়াস্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে ঐশী গুণরাজির বিকাশস্থল হন। তখন খোদার অনন্ত ভাণ্ডারে সুপ্ত ও অপ্রকাশিত রহস্যসমূহ তার মাধ্যমে পৃথিবীতে বিকশিত হতে আরম্ভ হয়।

যে খোদা বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন তিনি কৃপণ নন। তাঁর জ্যোতি চিরস্থায়ী। তাঁর কোন নাম বা কোন গুণ কখনো বিনষ্ট হয় না। ঈশ্বরপরায়ণ ও পরিশ্রমী মু'মিনকে তিনি পুরাকালে যা দিতেন এ কালেও তা দিবেন। খোদা তাআলা দোয়া শিখিয়েছেন– **ইহ্‌দিনাসসিরাত্বাল মুস্তাকীমা সিরাত্বাল্লাযীনা আনআমতা আলায়হিম–** (সূরা ফাতিহা) হে আমার খোদা, আমাদেরকে সেই সরল-সুদৃঢ় পথ দেখাও যা সেই লোকেদের পথ যাদেরকে তোমার ফযল ও ইন্‌আম, করুণা ও পুরস্কার প্রদান করেছ। এ আয়াতের অর্থ এই, নবী ও সিদ্দীকদের যে ফযল ও ইন্‌আম, করুণা ও পুরস্কার পুরাকালে প্রদান করেছো এর সব আমাদেরকে প্রদান কর। কোনরূপ করুণা হতে আমাদেরকে নিরাশ করো না। এ আয়াতে মুসলমান জাতিকে এক বড় আশা দেয়া হয়েছে যা পূর্ববর্তী কোন জাতিকে দেয়া হয় নি। নবীদের কামালত (পূর্ণতা বা পূর্ণ গুণসমূহ) বিভিন্ন। প্রত্যেক নবীকে এক বিশেষ কামাল বা উৎকর্ষ দেয়া হয়েছিল। প্রত্যেককেই বিশেষ বিশেষ ফযল ও ইনআম, করুণা ও পুরস্কার দেয়া হয়েছিল। এক নবী যে কামাল পেয়েছিলেন অন্য নবী তা পান নি। এক নবীকে যে পুরস্কার দেয়া হয়েছিল অন্য নবীকে তা দেয়া হয় নি। খোদা তাআলা মুসলমানদেরকে এ প্রার্থনা শিখিয়ে বলেছেন, পয়গম্বরদেরকে বিভিন্নভাবে যে বিভিন্ন কামালত দেয়া হয়েছিল তোমরা সেসব একাধারে পাবার জন্য আমার করছে প্রার্থনা কর। অতএব যখন বিভিন্ন কামালত (পূর্ণগুণসমূহ) একাধারে একত্র হবে তখন সেগুলোর সমষ্টি যে ভিন্ন ভিন্ন কামাল হতে অত্যাধিক হবে তা স্বতঃসিদ্ধ। এজন্যই বলা হয়েছে– **কুনতুম খয়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন্‌নাস–** (সূরা আলে ইমরান : ১১১) অর্থাৎ কামালত বা পূর্ণতাসমূহের হিসেবে তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। এ বিভিন্ন উৎকর্ষ এ জাতিতে

একত্র হবার প্রতিশ্রুতি কেন দেয়া হলো? কারণ আমাদের নবী মুহাম্মদ (স.)-কে সব রকম কামালত একাধারে দেয়া হয়েছে। কুরআন শরীফে লিখিত আছে, **ফাবিহুদা হু মুকতাদিহ–** (সূরা আনআম : ৯১) অর্থাৎ বিভিন্ন নবীকে যে বিভিন্ন হেদায়াত (আদেশ ও উপদেশ) দেয়া হয়েছিল তুমি এর সবগুলো পালন কর। একথা বেশ স্পষ্টই বুঝা যায় যিনি একাকী বিভিন্ন হেদায়াত মেনে চলবেন। তিনি সব কামালত একাধারে লাভ করবেন ও সব নবী হতে শ্রেষ্ঠ হবেন। আবার যিনি এসব কামাল একাধারে অর্জনকারী পয়গম্বরকে অনুসরণ করে তাঁর অনুচর হবেন, তিনিও ছায়াস্বরূপ সব কামালত একাধারে অর্জন করবেন। অতএব যে কামেল মুসলমানগণ সব কামাল একাধারে অর্জনকারী নবীর অনুসরণ করবেন, তারা নিজেরাও যাবতীয় কমালত একাধারে অর্জন করবেন। যারা মুসলমান জাতিকে মরা জাতি মনে করে তাদের জন্য কত পরিতাপ! খোদা তাদের সব কামাল একাধারে অর্জন করতে প্রার্থনা শিখিয়েছেন। কিন্তু তারা একেবারে মৃত হয়েই থাকতে চায়। তাদের মতে যদি কোন মুসলমান দাবী করে মসীহ্ ঈসা ইবনে মরিয়মের মত আমার প্রতিও ওহী অবতীর্ণ হয়[১৯] তবে সে কাফির, কারণ

১৯. মৌলবীরা যখন বলেন, মুসলমানরা কেউই ঈসা ইবনে মরিয়মের মসীল (সমকক্ষ ও অনুরূপ ব্যক্তি) হতে পারবে না তখন তারা আমদের প্রভু ও নেতা সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর ও সবশ্রেষ্ঠ রসূলের অপমান করে। এর মত ব্যক্তি ইসলাম ধর্মে জন্ম গ্রহণ করা অসম্ভব ভেবে তারা বিশ্বাস করে, মোহরে নবুওয়ত ভগ্ন করে খোদা তাআলা ইস্রাঈল বংশীয় ঈসাকে আবার দুনিয়াতে প্রেরণ করবেন। এ বিশ্বাসের দরুন তারা দুই পাপে পাপী (এক) প্রথমত তাদেরকে বিশ্বাস করতে হয়, খোদার এক দাস ঈসা যাকে হিব্রু ভাষায় যিশু ত্রিশ বছর যাবত আল্লাহ্‌র নবী মূসা (আ:)-এর শরীয়ত পালন করে পয়গম্বরী পেয়েছিলেন। কিন্তু ত্রিশ বছরের পরিবর্তে পঞ্চাশ বছর হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (স:)-এর শরীয়ত সম্পূর্ণরূপে পালন করে কোন ব্যক্তি কোন কালেই উক্ত পদ লাভ করতে পারবে না; যেন হযরত (স:)-এর অনুসরণের মাধ্যমে কোনই কামালত বা আধ্যাত্মিক কল্যাণ অর্জন করা যায় না। তারা ভেবে দেখে না, এটা সত্য হলে খোদা তাআলার **ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুস্তাকীম** দোয়া শিক্ষা দেয়া শুধু ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা বৈ আর কিছুই হয় না। তাদের বিশ্বাস দ্বিতীয়বার আগমনের হিসেবে তিনি শেষ বিচারক ও সব মতভেদের নির্ভুল মীমাংসাকারী ও হাকাম। তারা বুঝতে পারে না, যেমন মুসলমানদের মাঝে মূসার অনুরূপ লোক জন্মিবে তেমন ঈসার অনুরূপ লোকও জন্মিবে। তিনি এক হিসেবে নবী হবেন অন্য হিসেবে 'উম্মতী' হবেন। খোদা তাআলার ভবিষ্যদ্বাণীতে এটাই ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য ছিল। মরিয়মের পুত্র ঈসা, নবী ও উম্মতী উভয় নাম পেতে পারেন না। কারণ যিনি কোন নবীকে অনুসরণ করে কামাল অর্জন করেন শুধু তাকেই উক্ত নবীর উম্মতী বলা যায়। কিন্তু ঈসা নবী মুহাম্মদ (স:)-এর অনুসরণ ছাড়াই কামাল অর্জন করে নবী হয়েছেন। (দুই) দ্বিতীয় পাপ এই, তারা কুরআন শরীফের স্পষ্ট আয়াতের বিরুদ্ধে হযরত ঈসাকে জীবিত বলে কল্পনা করে। কুরআনে স্পষ্ট আয়াত আছে– **ফালাম্মা তাওয়াফ্‌ফায়তানী কুনতা আন্‌তার রকীবা আলায়হিম–** (সূরা মায়েদা : ১১৮)। তারা এ আয়াতের অর্থ করেন– **যখন তুমি আমাকে জড়দেহে আকাশে উঠিয়ে নিলে**- কি অদ্ভুত ভাষাজ্ঞান! কি অদ্ভুত তাদের ভাষা!!! হযরত ঈসার জন্যই শুধু, আর কারও জন্য এ শব্দের এ অর্থ হয় না; শুধু তাঁর জন্য সম্পূর্ণ

পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত খোদা তা'লার সাথে বাক্যালাপ ও সাদর সম্ভাষণের দাবী সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ। তারা স্বীকার করে, খোদা তাআলা পূর্বে যেমন শ্রবণ করতেন এখনও তেমন শ্রবণ করেন কিন্তু খোদা তাআলা পূর্বে যেমন কথা বলতেন এখনও তেমন কথা বলেন, তারা একথা স্বীকার করে না। কিন্তু তিনি যদি এ যুগে বাস্তবিকই কথা না বলেন, তবে যে কথা শ্রবণ করতে পারেন এর প্রমাণ কী? যারা খোদার কোন গুণ বা সিফত কখনো নষ্ট হয় বলে ধারণা করে তারা বড়ই হতভাগ্য, এরাই ইসলাম ধর্মের শত্রু। এরা খতমে নবুওয়তের ব্যাখ্যা করে যাতে হযরতের নবুওয়তই বাতিল হয়। হযরত (স.)-এর অনুসারী হলে যেসব বরকত ও সম্পদ পাওয়া উচিত ছিল, সেগুলো এখন আর পাওয়া যায় না, সব বন্ধ হয়েছে। এখন খোদার সাথে বাক্যালাপের অভিলাষ ও আশা শুধু দুরাশা। এই কি খতমে নবুওয়তের অর্থ? ওয়া লা নাতাল্লাহি আলাল কাযেবীন। এমন হলে হযরতের অনুসারী হয়ে কী লাভ তা কি এরা বলতে পারেন? ধর্মমত হিসেবে যাদের হাতে অতীত কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নেই? তাদের জন্য খোদার মা'রেফতের দুয়ার অবরুদ্ধ। কিন্তু ইসলাম জীবন্ত ধর্ম। কুরআন শরীফে সুরা ফাতিহাতে খোদা তাআলা মুসলমানদেরকে পুরাতন পয়গম্বরদের ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) সাব্যস্ত করেছিলেন। পুরাতন নবীদেরকে যেসব সম্পদ দেয়া হয়েছিল, তা সবই লাভ করার প্রার্থনা শিখিয়েছেন। শুধু গল্পকাহিনীই যাদের

স্বতন্ত্র ভাষা!!! দুঃখের বিষয়, তারা এতটুকুও ভাবেন না, পুনরুত্থান বিষয়ে হযরত ঈসাকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হবে বলে কুরআনে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। অতএব **মুতাওয়াফফিকার** যে অর্থ করা হয়, তাতে বাধ্য হয়ে স্বীকার করতে হয় মরণের পূর্বেই ঈসা প্রবল প্রতাপান্বিত মহা বিচারক খোদা তাআলার সামনে হাজির হবেন। যদি বল **ফালাম্মা তাওয়াফ্ফায়তানী**– এর অর্থ **যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে** তবে অর্থ হবে, '**আমার মরণের পর আমার অনুচরগণ কোন্ পথ অবলম্বন করেছিল আমি তা কিরূপে জানি**।' তবে এ ব্যাখ্যাও তাদের মতে অশুদ্ধ হয়। উভয় ব্যাখ্যানুসারেই খোদা তাআলা এমন অসঙ্গত আপত্তি ও অসঙ্গত উত্তরের জবাবে ঈসাকে বেশ বলতে পারেন, 'তুমি তাদের অবস্থা জান না বলে আমার সম্মুখে কেন মিথ্যা বলছো? তুমি যে দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে গমন করেছিলে, চল্লিশ বছর বাস করে খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলে, তাদের সলীব (ক্রুশ) ভগ্ন করে ছিলে এটা কি তোমার মনে নেই? এছাড়া এ ব্যাখ্যামতে স্বীকার করতে হয়, যত দিন হযরত ঈসা জীবিত ছিলেন ততদিন খ্রিষ্টানরা পথভ্রষ্ট হয় নি, তাঁর মৃত্যুর পর তারা পথভ্রষ্ট হয়েছিল। সুতরাং মৌলভীদেরকে স্বীকার করতে হয় খ্রিষ্টানগণ এখনও সত্য ধর্ম ও সত্যপথে অবস্থিত আছে। কেননা, এখনও হযরত ঈসা জীবিতাবস্থায় আসমানে মজুদ আছেন। হায় পরিতাপ!! হায় লজ্জা!!! অবশেষে মনে রাখা উচিত, কোন মুসলমান যদি হযরত মুহাম্মদ (স:)-এর অনুসরণের ফলে ওহী-ইলহাম ও নবীর পদ প্রাপ্ত হন তবে এমন মুসলমানের নবী হওয়ার ফলে মোহরে নবুওয়ত ভগ্ন হয় না। কেননা, তিনি হযরতেরই অনুচর। তার স্বতন্ত্র স্বাধীন অস্তিত্ব নেই। তার কামালত তার প্রভুরই কামালত। তিনি শুধু নবী নন, নবী ও উম্মতী দুই-ই। কিন্তু যিনি হযরতের উম্মত (অনুচর) নন এমন নবীর দ্বিতীয়বার আগমন খতমে নবুওয়তের সম্পূর্ণ বিপরীত ও প্রতিকূল। এতে মোহরে নবুওয়ত ভেঙ্গে যায়।

সম্বল তারা কিরূপে নবীদের ওয়ারিশ বলে গণ্য হবে? দুঃখের বিষয় তাদের সামনে সব বরকত ও সম্পদের ফোয়ারা ফুটে উঠেছে, কিন্তু তারা এক ঢোকও পান করে না।

আবার আমি মূল বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করে বলছি, মুক্তির উৎপত্তিস্থল প্রেম ও জ্ঞান। জ্ঞানের প্রকৃতি এই, জ্ঞান বৃদ্ধির অনুপাতে প্রেম বৃদ্ধি হয়। সৌন্দর্য বা উপকার লাভ প্রেমোচ্ছ্বাসের মূল কারণ। মানুষ যখন জ্ঞান অর্জন করত ঐশী সৌন্দর্য ও উপকারিতা বুঝতে পারে যে তার পরমেশ্বর আপন অসীম ব্যক্তিগত সৌন্দর্যে কত সুন্দর ও তাঁর অনন্ত উপহার তাকে সবদিকেই কেমন পরিবেষ্টন করেছে তখন মানবাত্মায় নিহিত স্বাভাবিক ঈশ্বরপ্রেম তরঙ্গায়িত ও উদ্বেলিত হয় এবং সে খোদা তাআলাকে সর্বাধিক সৌন্দর্যাধার ও অবিরাম সর্বাধিক উপকারদাতা গুণাকর দেখে সর্বাধিক ভালবাসে[২০]। সে তখন শুধু বাক্যে সীমাবদ্ধ না করে কার্যত ও বাস্তবিকই তাঁকে একমাত্র অদ্বিতীয় প্রিয়তম বলে জ্ঞান করে। তাঁর চরিত্র ও সুষমায় আসক্ত হয়। ঈশ্বর প্রেমের বীজ মানব স্বভাবে চির-নিহিত, তবুও শুধু ঈশ্বর-জ্ঞানই উক্ত বীজে জলসেচন ও রসপ্রদানে সমর্থ। কোন প্রিয়জনই জ্ঞানরূপ সৌন্দর্য বিকাশ, সৎস্বভাব ও সম্মিলন ছাড়া প্রেমিকের মনাকর্ষণে সক্ষম হয় না। পূর্বজ্ঞান লাভ হলেই ঐশী প্রেমের সমুজ্জ্বল অগ্নিশিখা মানব হৃদয়ে অকস্মাৎ পতিত হয়ে খোদা তাআলার দিকে তাকে আকর্ষণ করতে আরম্ভ করে। তখন মানাবাত্মা প্রেমসূলভ বিনয় ও নম্রতাসহ অনন্ত অনাদি প্রিয়তমের দুয়ারে পতিত হয়ে একত্ববাদ ও তৌহীদের অকুল সাগরে ঝাঁপ দেয় এবং এতে এত নির্মল ও পবিত্র হয় যে গোটা সাংসারিক অপবিত্রতা ও স্থুলতা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়ে তার অন্তর মহা জ্যোতির্ময় পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয়। তখন খোদা তাআলা যেমন কুকর্ম ও কুকথা ঘৃণা করেন তেমনি সে-ও কুকর্ম ও কুকথা ঘৃণা করে। খোদার সন্তোষই তার সন্তোষ হয়। খোদা যাতে রাজী থাকেন সে-ও তাতেই রাজী থাকে।

---

২০. বহুবার আমি লিখেছি ওহী, আকাশবাণী অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের বাক্যালাপ, সাদর সম্ভাষণ, আকাশবাণী-লব্ধ অসাধারণ নিদর্শন ছাড়া (যা তাঁর ঈশ্বরের সুস্পষ্ট প্রমাণ) খোদা তাআলার পুর্ণজ্ঞান কখনো পাওয়া যায় না। যে জ্ঞানের জন্যে জ্ঞানার্থীর তীব্র ক্ষুধা ও পিপাসা হয় তা-ই জ্ঞান। যে জ্ঞানাভাবে সে মৃত ও প্রাণহীন হয় তা-ই জ্ঞান। এমন জ্ঞান কি ইসলাম ধর্মে মজুদ নেই। এটা কি নির্জীব ও নিরস ধর্ম? ইসলামই একমাত্র জীবন্ত ধর্ম। শুধু এটাই আপন অনুসারীদের জীবন প্রদানে সক্ষম। শুধু এতেই ইহলোকে ঈশ্বর দর্শন সম্ভবপর। এরই আশীর্বাদে আমরা ইলহাম ও আকাশবাণী প্রাপ্ত হই। পৃথিবীর অন্যান্য প্রত্যেক ধর্মই জীবনবিহীন, আর্শীবাদবিহীন, মঙ্গলবিহীন, আলোকবিহীন। পরধর্ম মতে জীবন যাপন করে খোদার সাথে বাক্যালাপ করতে পারি না, তাঁর অলৌকিক কর্ম দর্শন করতে সমর্থ হই না- এসব সম্পদ ও বরকত নিয়ে কেউ কি আমাদের সাথে প্রতিযোগিতা করতে সাহসী হবেন?

কিন্তু ইতোপূর্বে আমি উল্লেখ করেছি, এ উচ্চতর প্রেম উচ্ছ্বসিত করতে ঐশী সৌন্দর্য ও উপকারিতার জ্ঞান উত্তমরূপে অর্জন করা আবশ্যক। খোদা তাআলার ব্যক্তিগত সৌন্দর্য, রূপ ও গুণ অসীম। তাঁর উপকার অসীম। সদা তিনি এত উপকার সাধনে প্রস্তুত এর চেয়ে অধিকতর উপকার লাভ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এসব কথা তার হৃদয় ফলকে অঙ্কিত থাকা আবশ্যক। খোদা তাআলাকে ধন্যবাদ যে এ পূর্ণজ্ঞানের উপকরণ মুসলমানদেরকে পূর্ণ মাত্রায় প্রদান করা হয়েছে। আমাদেরকে খোদা তাআলার গুণ ও সৌন্দর্য বর্ণনায় লজ্জায় পড়তে হয় না[২১] এবং যত সুষমা কল্পনা করা ও মানব হৃদয়ে ধরা সম্ভবপর, এর সবই তাঁর স্বরূপ ও গুণে, সত্তায় ও গুণে বিদ্যমান বলে বিশ্বাস করি। আমরা আর্য্যসমাজের ন্যায় বলি না তিনি আত্মা ও পরমাণু সৃষ্টি করতে অক্ষম। তিনি এত অণুদার যে অনন্ত মুক্তি প্রদানে অনিচ্ছুক। তাঁর ওহী ও আকাশবাণীর দ্বার অবরুদ্ধ। তিনি এত কঠিন হৃদয় যে কারও তওবা কবুল করেন না। এক পাপের জন্য আত্মাকে কোটি কোটি যোনিতে নিক্ষেপ করেন এবং তওবা কবুল করতে অপারগ। আমরা খ্রিষ্টানদের ন্যায় বলি না– আমাদের খোদা কোন কালে মরে ছিলেন, ইহুদীর হাতে বন্দী হয়েছিলেন, কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছিলেন, এক অবলার গর্ভে জন্মেছিলেন। তাঁর আরো সহোদর ভাই ছিল। মানুষের পাপভার কমাবার জন্য তিন দিন যাবৎ নরকবাসী ছিলেন। নিজ দাসদের পাপের বদলে নিজ প্রাণ বিনাশ না করে এবং নিজে তিন দিন নরক ভোগ না করে নিজ দাসদেরকে পাপমুক্ত করতে অক্ষম ছিলেন। আমরা খ্রিষ্টানদের ন্যায় এ-ও বলি না হযরতের পর ওহী ও ইলহাম সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়েছে। খোদা তাআলার সাথে বাক্যালাপের দ্বার অবরুদ্ধ হয়েছে। সূরা ফাতিহায় খোদা তাআলা আমাদের সব নবীর বিভিন্ন সম্পদের ওয়ারিশ সাব্যস্ত করেছেন। মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ জাতি বলেছেন। অতএব যে ঐশী সৌন্দর্য ও উপকারিতা প্রেমের উৎপত্তিস্থল এতে সর্বাধিক পরিমাণে বিশ্বাস স্থাপন শুধু আমাদেরই ভাগ্যে জুটেছে।

---

২১. কোন খ্রিষ্টান যখন শুনতে পায়, তার খোদা কোন কালে তিন দিন মৃত ও প্রাণহীন অবস্থায় পতিত ছিলেন, তখন তার আত্মাকে ধিক্কার দেয়। খোদাও কি কখনো মরেন? যিনি একদা মরেছিলেন তিনি যে পুনরায় মরবেন না এরই বা কি ভরসা? এমন খোদা যে বেঁচে আছেন এরই বা কি প্রমাণ? হয়ত তিনি মরে গেছেন, জীবিত মানুষদের প্রতি তাঁর অস্তিত্বের কোনই চিহ্ন দেখা যায় না। যারা তাঁকে খোদা! খোদা! বলে থাকে তিনি তাদেরকে কোনই উত্তর দিতে পারেন না। তিনি কোন অলৌকিক কার্য সাধন করতে পারেন না। অতএব নিশ্চয় জানবেন, তিনি মরে গেছেন, কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে খানইয়ার স্ট্রিটে তাঁর কবর আছে। আর আর্য্যসমাজের কথা তাদের আত্মাদের কোন খোদাই নেই, নিজেরাই অনাদি, অনন্ত ও নিজগুণে আত্মাদের কোন খোদাই নেই, তারা তো নিজেরাই অনাদি, অনন্ত ও নিজগুণে বিদ্যমান।

মুসলমানদের মাঝে যারা খোদার এ পূর্ণ সৌন্দর্য ও উপকার অস্বীকার করে, তাঁর সৃষ্টবস্তুতে তাঁর বিশেষ গুণ আরোপিত করে খোদার একত্বে সন্দেহ জন্মায়[২২] তাঁর একত্ব, সৌন্দর্য, জ্যোতির বিনিময়ে অপরের সাথে অংশীদার নির্ধারণ করে এবং গ্রহণ করে তারাই সর্বাপেক্ষা অধম। তারা হযরত (স:)-এর অনন্ত জ্যোতিকে তাদের জন্যে সীমাবদ্ধ মনে করে, যেন (খোদার আশ্রয় প্রার্থনা করি) হযরত জ্বলন্ত প্রদীপ নন, তিনিও যেন নির্বাপিত প্রদীপ। তাঁর কাছ থেকে অন্য প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হওয়া যেন অসম্ভব। মূসা নবী জ্বলন্ত প্রদীপ, তাঁকে অনুসরণ করে শত শত লোক পয়গম্বর হয়েছেন। ঈসা মসীহ্ তাঁকেই অনুসরণ করে তওরাত কিতাবের আদেশ মেনে মূসার শরীয়তের জোয়াল কাঁধে বয়ে নবুওয়তের পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের নেতা ও প্রভু হযরত মুহাম্মদ (স:)-কে অনুসরণ করে কেউই আধ্যাত্মিক পুরস্কারের যোগ্য হলো না। একদিকে- **মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম্‌মির রিজালিকুম–** (সূরা আহযাব : ৪১) আয়াতানুসারে তাঁর দৈহিক স্মৃতি ও বংশ রক্ষার জন্য কোন পুত্র সন্তান নেই। অপরদিকে আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহের পূর্ণগুণরাজি (রূহানী কামালত)-এর উত্তরাধিকারী হবার উপযুক্ত কোন আধ্যাত্মিক সন্তানও তাঁর ভাগ্যে জুটল না এবং খোদা তাআলার কালাম- **ওয়া লাকির রসূলাল্লাহি ওয়া খাতামান্‌নাবীঈন-** অর্থশূন্য হলো। আরবী ভাষায় 'লাকিন' শব্দ 'ইস্তিদরাক'-এর জন্য ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ যে বিষয় পূর্বে লাভ করতে পারা যায় না তা-ই

---

২২. মুসলমানরা, বিশেষত আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের লোকেরা, তৌহীদ বা একত্ববাদের বড়ই উচ্চ দাবী করতো। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এটা এখন উট ছন্ না আওর মচ্ছর গিল্‌না, (বব্বাড়ম্বে লঘু ক্রিয়া) এ প্রবাদ বাক্য তাদের ওপর প্রযোজ্য হয়েছে। আচ্ছা এমন লোকদেরকে কি একত্ববাদী বলতে পারি, যারা এক দিকে হযরত ঈসা (আ:)কে খোদা তাআলার মত এক ও অদ্বিতীয় মনে করে শুধু তিনিই জড়দেহে আকাশে (স্বর্গে) গিয়েছেন, শুধু তিনিই কোন কালে জড়দেহে ভূতলে অবতীর্ণ হবেন, শুধু তিনিই পক্ষী সৃষ্টি করেছিলেন। আমাদের নবী (স.)-কে কাফিররা বারবার শপথ করে বলেছে, হে আল্লাহর রসূল তুমি জড়দেহে আকাশে উঠে দেখাও তা হলে আমরা এখনই ঈমান আনব। তাদেকে উত্তর দেয়া হয়েছে, **কুল সুবহানা রব্বি হাল কুনতু ইল্লা বাশারার রসূলা-** অর্থাৎ তাদের বলে দাও, আমার খোদা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা হতে পরম পবিত্র এবং তাঁর বাণী অনুসারেই তিনি জড়দেহে আকাশে যেতে পারেন না। কেননা, এ কর্ম খোদা তাআলার প্রতিশ্রুতির প্রতিকূল। তিনি (কুরআনে) বলেছেন– **ফীহা তাহ্ ইয়াওনা ও ফীহা তামুতুনা ও লাকুম ফিল আরযে মুস্তাকাররুন**। অতএব আমরা কি মনে করব– হযরত ঈসা (আ.)-কে আকাশে উঠিয়ে নেবার সময় খোদা তাআলা নিজ অঙ্গীকার ভুলে গিয়েছিলেন অথবা মনে করব ঈসা মানুষ ছিলেন না? যিশু যদি জড়দেহে আকাশে গিয়ে থাকেন তবে কুরআনে বর্ণিত নীতি অনুসারে এটাই সুসিদ্ধ হয় যে যিশুখ্রিষ্ট মানুষ ছিলেন না। আবার এ মুসলমান হবার দাবীকারকরা দজ্জালের এমনসব গুণ বর্ণনা করে, যাতে সে একেবারে স্বয়ং পরমেশ্বর হয়ে পড়ে। হায়, এই কি একত্ববাদ, এই কি ধর্মপরায়ণতার দাবী!

লাভ করার সংবাদ অন্য উপায়ে বলে দেয়া হয়। এ অনুসারে এ আয়াতের অর্থ এই– হযরতের দৈহিক পুত্র সন্তান কেউই নেই, কিন্তু তাঁর বহু আধ্যাত্মিক পুত্র জন্মিবে। আর তিনি নবীদের মোহর হলেন অর্থাৎ ভবিষ্যতের কোন পূর্ণগুণ বা কামালই তাঁর অনুসরণের ছাপ (মোহর) ছাড়া কেউ লাভ করতে সমর্থ হবে না।

এ আয়াতের এ অর্থকে উল্টিয়ে ঘোষণা করা হয়েছে, নূরে নবুওয়ত চিরকালের জন্যে বন্ধ হয়েছে। কিন্তু এতে হযরত (স:)-কে দুর্নাম করা হচ্ছে ও তাঁর ক্ষতি সাধন করা হচ্ছে। অপরকে নিজ নবুওয়তের কামাল ও পূর্ণতা প্রতিচ্ছায়ারূপে প্রদান করার ক্ষমতা এবং আধ্যাত্মিকভাবে পূর্ণরূপে প্রতিপালন করার যোগ্যতাই পয়গম্বরের পূর্ণতার লক্ষণ। এ আধ্যাত্মিক প্রতিপালনের উদ্দেশ্যেই পয়গম্বরগণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন এবং সত্যান্বেষণকারীদেরকে মায়ের মত কোলে নিয়ে খোদার মা'রেফত ও ঐশী তত্ত্বজ্ঞানের দুগ্ধ পান করিয়ে থাকেন। সুতরাং হযরতের কাছে এ দুধ যদি না থাকে তবে, নাউযুবিল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করি) তাঁর নবুওয়তের সত্যতাই প্রতিপন্ন হয় না। কিন্তু খোদা তাআলা কুরআন শরীফে হযরতকে 'সিরাজাম মুনীরা' বা উজ্জ্বলকারী আলোকময় প্রদীপ আখ্যা প্রদান করেছেন এবং বলেছেন, এ প্রদীপ অপরাপরকে প্রজ্জ্বলিত ও আলোকময় করবে এবং নিজ জ্যোতির প্রভাব বিস্তার করে অপরাপরকে নিজেরই মত করে গড়ে তুলবে। আঁ হযরত (স:)-এর অভ্যন্তরে যদি নাউযুবিল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করি) আধ্যাত্মিক জ্যোতি বিকিরণ শক্তি বিদ্যমান না থাকে তবে তাঁর পৃথিবীতে প্রেরিত হওয়া অনর্থক হয়েছে। আবার পক্ষান্তরে খোদা তাআলাকে তো এই বলে প্রতারক নির্দেশ করা হয়েছে, তিনি শিক্ষা দিলেন, তোমরা সব পয়গম্বরের সব কামাল বা উৎকর্ষ একাধারে অর্জন করতে প্রার্থনা কর। কিন্তু কখনো এসব উৎকর্ষ কাউকেও প্রদান করবেন এমন অভিলাষ তাঁর হৃদয়ে বিদ্যমান ছিল না বরং তাঁরই ইচ্ছা ছিল চিরকাল সবাইকে একেবারে অন্ধ করে রাখবেন। কিন্তু হে মুসলমানগণ! সাবধান হও, এমন ধারণা শুধু মূর্খতা ও বোকামী ছাড়া কিছুই নয়। ইসলাম ধর্ম যদি এমনই মৃত নির্জীব ধর্ম হয় তবে তোমরা কোন্ জাতিকে এ দিকে আহ্বান করতে সক্ষম হবে? আচ্ছা, তোমরা কি এ ধর্মের মৃতদেহ জাপানে প্রেরণ করবে অথবা উউরোপের সামনে উপস্থিত করবে! পূর্ববর্তী ধর্মগুলোর তুলনায় যে ধর্মে কোন কল্যাণ ও আধ্যাত্মিকতা নেই একে ভালোবাসবে এমন গণ্ডমূর্খ কে? পুরাতন ধর্মে নারীদের প্রতি ইলহাম বা ঐশীবাণী অবতীর্ণ হতো, যেমন মূসার মাতা এবং বিবি মরিয়ম। আর তোমরা পুরুষ হয়েও এ স্ত্রীলোকদের সমান হলে না! না!! না!!! ওহে মূর্খরা, ওহে চক্ষুষ্মান অন্ধরা, আমাদের নেতা ও প্রভু, তাঁর প্রতি হাজার সালাম, নিজ জ্যোতি বিকিরণ ক্ষমতায় সব পয়গম্বরের অগ্রণী হয়েছেন। পূর্বতন পয়গম্বরের জ্যোতি

বিকিরণ ক্ষমতা এক নির্দিষ্ট সীমায় উপনীত হয়ে বিলুপ্ত হয়েছে। এখন সেসব ধর্ম ও সেসব জাতি মৃত ও জীবনবিহীন। এদের জীবন লয় পেয়েছে। কিন্তু আঁ হযরত (স:)-এর রূহানী ফয়েয বা আধ্যাত্মিক জ্যোতি বিকীরণকারী শক্তি পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত প্রবহমান থাকবে। সুতরাং তাঁর এ জ্যোতি বিকিরণ শক্তি বিদ্যমান থাকতে, পরজাতি হতে মসীহ্ আগমন করার আবশ্যকতা নেই। না! না!! বরং তাঁর ছায়ায় প্রতিপালন অতি সামান্য মানুষকেও মসীহ্রূপে গড়ে তুলতে পারে, যেমন তিনি আমাকে মসীহ্রূপে গড়ে তুলেছেন।

এখন পুনরায় আমি মূল বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করে ইসলাম ধর্ম প্রদর্শিত মুক্তি পথের গভীর দার্শনিক তত্ত্বের কথা লিখছি। মানব স্বভাবে অনাদিকাল হতে এক হলাহল বিষ নিহিত আছে। তাকে এটা পাপের প্রতি প্রলুব্ধ করে। তেমন আবার সেই হলাহলের প্রতিষেধক ঈশ্বর প্রেমও এতে অনাদিকাল হতেই বিদ্যমান আছে। মানুষ যখন সৃষ্ট হয়েছে তখন থেকেই এ শক্তি দুটি তার সাথে সাথে চলে আসছে। বিষাত্মক শক্তি মানুষের জন্য শক্তির উপকরণ সংগ্রহ করে। আর বিষনাশিণী শক্তি ঈশ্বর প্রেমের আগুন পাপগুলোকে খড়কুটার মত জ্বালিয়ে দেয়। ঐশী শাস্তির উপকরণ পাপশক্তি আদি কাল হতে মানব-স্বভাবে সংস্থাপিত ছিল। কিন্তু পাপ হতে উদ্ধার প্রাপ্তির উপকরণ শুধু অল্পদিন পূর্বে, অর্থাৎ যখন যিশুখ্রিষ্ট ক্রুশ বিদ্ধ হলেন ঠিক সে সময়ে সৃষ্ট হয়েছে– যার মাথায় এক বিন্দু পরিমাণ সরল বুদ্ধি নেই শুধু তারই পক্ষে এমন বিশ্বাস গ্রহণযোগ্য। বস্তুত উভয়বিধ উপকরণই আদিকাল হতে– মানুষ যখন সৃষ্ট হয়েছে তখন হতে মানব প্রকৃতিতে প্রদত্ত হয়েছে। পাপের উপকরণতো পরমেশ্বর প্রারম্ভিক যুগেই স্থাপন করে নেন, কিন্তু মুক্তির ঔষধ সৃষ্টি করতে তখন তাঁর মনে ছিল না, চার হাজার বছর পরে স্মরণ হয়েছে এমন নয়।

এখন আমি এ প্রবন্ধ শেষ করছি এবং শুধু আল্লাহ্র উদ্দেশ্য আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি, আপনি জীবন্ত কল্যাণ, আশীর্বাদ, মঙ্গল ও সম্পদ প্রার্থনা করলে যিনি বহুকাল পূর্বে মরে গেছেন সেই মসীহ্র নাম নিবেন না। তাঁর জীবন্ত কল্যাণ, আর্শীবাদ, মঙ্গল ও সম্পদের এক বিন্দুও বিদ্যমান নেই। তাঁর স্বজাতিরা ঈশ্বর প্রেমের মত্ততার পরিবর্তে মদিরার মত্ততায় সবার চেয়ে অগ্রণী হয়েছে এবং ঐশী সম্পত্তি গ্রহণের পরিবর্তে সাংসারিক সম্পত্তিতে আসক্ত হয়েছে। এজন্য জুয়াখেলা, ছলনা, প্রতারণা অবলম্বন করতেও কুণ্ঠিত হচ্ছে না। যে মুহাম্মদী মসীহ্, 'ইমামুকুম মিনকুম' হয়ে নগদ কল্যাণ, সম্পদ, আশীর্বাদ ও মঙ্গল পেশ করেছেন তাঁর জামাতে প্রবেশ করা আপনার কর্তব্য। এখন আপনার অভিরুচি।

ভূমিকম্পের ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন

বন্ধুগণ! জাগো, আবার ভূমিকম্প আসতে যাচ্ছে।
আবার খোদা অতি শীঘ্র নিজ শক্তি দেখাবেন।
তোমরা ফেব্রুয়ারি মাসে যে ভূমিকম্প দেখেছিলে,
নিশ্চয় জেনো তা বুঝাবার জন্যে এক ধমক মাত্র।
ওহে বন্ধুগণ! চোখের জল দিয়ে এর প্রতিকার কর,
হে অসতর্ক লোকেরা! আকাশ যে এখন আগুন ঝরাবে।
ভূমিকম্প আসবে না কেন? ধর্মপরায়ণতার পথ বিলুপ্ত হয়েছে।
মুসলমান যে শুধু মুসলমান নামেই পরিণত হয়েছে!
ভয় করে কে মোর কথা মেনেছে? কে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ছড়িয়েছে?
মম জীবন তো তাদের গালি খাবার জন্যেই যেন সৃষ্টি হয়েছে!
তারা আমাকে, কাফির, দজ্জাল বলছে,
সততা ও সরলতাসহ কে বিশ্বাস স্থাপন করতে চাইছে?
যার দিকে দৃষ্টি দাও দেখবে কুধারণা ও সন্দেহজনক মন নিয়ে সীমালংঘন করেছে,
কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, শত শত কুৎসা রটনা করছে,
তারা ধর্ম ছেড়ে দিয়েছে ও সংসারের প্রতি আসক্ত হচ্ছে
শত উপদেশ দাও, ভাল ভাল কথা বল কে অনুতাপ করছে?
ধর্মের এ মহা বিপদ দেখে মম হৃদয় ব্যাকুল হচ্ছে
তবে খোদার হাত এখন এ হৃদয়কে স্বস্তি দিচ্ছেন।
এ জন্যে এখন তাঁর গয়রত ও আত্মাভিমান তোমাদের কিছু দেখাবে,
চারদিক হতে মহা আপদ-বিপদ হাত প্রসারিত করবে।
আজ মৃত্যুর পথে ধর্মের কিছু সহায়তা পৌছবে,
নতুবা হে বন্ধুগণ! ধর্ম একদিন মরে যাবে।
এমন একদিন ছিল যখন এ ধর্মের জন্য রাজত্ব উৎসর্গীত হতো,
আর এখন এমন দিন এসেছে যখন বান্দারাও একে মিথ্যা বলছে ॥

বিজ্ঞাপন দাতা-

মির্যা গোলাম আহমদ
কাদিয়ানবাসী, প্রতিশ্রুত মসীহ্। ৯ই মার্চ, ১৯০৬ ঈসাব্দ।

মোনাজাত

ওহে যাঁর জন্য মম শির, প্রাণ, সব অণু-পরমাণু উৎসর্গীকৃত হয়েছে;
দয়া করে তব জ্ঞানের সব দুয়ার আমার হৃদয়ে খুলে দাও।
যে দার্শনিক শুধু নিজ বুদ্ধি বলেই তোমাকে অন্বেষণ করে, সে যে পাগল,
তব গোপনীয় পথ মানব-বুদ্ধি হতে অধিকতর দূরে।
তব পবিত্র দরবারের সংবাদ এদের কেউই অবগত হয়নি।
যে অবগত হয়েছে সে শুধু তোমারই অসীম করুণা বলে অবগত হয়েছে।
তুমি তোমার নিজ মুখের প্রেমিকগণকে উভয় জগৎ প্রদান করে থাক,
তব সেবকদের চোখে উভয় জগৎ কিছুই নয়।
একবার তুমি দৃষ্টিপাত কর, ঝগড়া-বিবাদ কমে যাক্
মানুষের জন্যে তব নিদর্শনরূপ আকর্ষণ অতি আবশ্যক।
এক নিদর্শন দেখাও, যেন তব জ্যোতি জগতে জ্বলে উঠে।
যেন বিধর্মীরাও তব প্রশংসা কীর্তনকারী হয়ে উঠে।
ভূমিকম্পে যদি দেশ উলট-পালট হয়ে যায় তাতে আমি দুঃখিত হই না,
তোমার উজ্জ্বল পথ অন্ধকার হবে সে ভয়েই আমি শোকাকুল,
ধর্ম সম্বন্ধে কথাবার্তা, তর্ক-বিতর্কে বহু 'মাথা বেদনা' হয়,
তব মহা ঐশ্বর্যময় নিদর্শন প্রদর্শন করে বিষয় সংক্ষেপ করে দাও।
বহু ভূমিকম্প দ্বারা শত্রুগণের প্রকৃতি কাঁপিয়ে তোল,
যেন তারা ভীত হয়ে শুধু তোমারই প্রাসাদের দিকে আগমন করতে পারে।
ভূমিকম্প বেশে করুণা প্রস্রবণ প্রবাহিত করে দাও,

তোমার এ কান্নারত দাস আর কতদিন শোকানলে জ্বলবে?